বাবা যখন ছোট

আলেক্সান্দর রাস্কিন

চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

বাবা যখন ছোট

আলেক্সান্দর রাস্কিন

অনুবাদ

ননী ভৌমিক

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩৯৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৪২০ ডিসেম্বর ২০১৩

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪২২ ডিসেম্বর ২০১৫

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪, মোবা. ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

ছবি এঁকেছেন
ল. তকমাকভ

মূল্য
একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0396-3

BABA JAKHON CHHOTO
A collection of true stories by Alexander Raskin
Translated from Russian by Nani Bhoumik
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price Tk. 130.00 only

সূচি

বাবা যখন ছোট

রঙিন বল ১৩
পোষ মানানো ১৬
পদ্য রচনা ১৯
প্রফেসরকে কামড় ২২
পেশা বাছাই ২৫
বাজনা শেখা ২৮
রুটি ছোড়া ৩১
বাবার রাগ ৩৪
বাবার ভুল ৩৭
লেখা শেখা ৩৯
ভাইকে ফেলে চম্পট ৪১
বাবার সই ৪৩
শক্তি পরীক্ষা ৪৫
স্কুল যাত্রা ৪৮

ইশকুলে বাবা

লেট লতিফ ৫৩
বাবার সিনেমা দেখা ৫৭
জ্বালাতন ৬০
বাবার বাঘ শিকার ৬২
ছবি আঁকা ৬৫
মিথ্যে কথা ৬৮
ট্রাম থামানো ৭১
সাপ মারা ৭৪
জার্মান ভাষার ওপর প্রতিশোধ ৭৮
দুটি রচনা ৮১
মায়াকোভস্কির সঙ্গে আলাপ ৮৪
আবৃত্তি ৮৭
পিঙ-পঙ খেলা ৯১
টুল বানানো ৯৬

লেখকের কথা

আদরের ছেলেমেয়েরা!

এ বইয়ের জন্মকথাটা বলি শোনো। আমার এক মেয়ে আছে— সাশা। এখন অবিশ্যি দিব্যি বড়সড়ো হয়ে উঠেছে সে, নিজেই বলে, 'আমি যখন ছোট্ট ছিলাম...' তা এই সাশা যখন ছিল একেবারেই ছোট্ট তখন ভারি ভুগত সে। কখনও ইনফ্লুয়েঞ্জা, কখনও টনসিলাইটিস। তার পর কানের ব্যথা। তোমাদের যদি কখনও কান কটকট রোগ হয়ে থাকে, তাহলে নিজেরাই বুঝবে সে কী যন্ত্রণা। আর যদি না হয়ে থাকে, তাহলে বুঝিয়ে বলা বৃথা, কেননা সে বোঝানো অসম্ভব।

একবার সাশার কানের যন্ত্রণা খুব বাড়ল, সারা দিন-রাত সে কাঁদল, ঘুমোতে পারছিল না। আমার এত কষ্ট লাগছিল যে নিজেরই প্রায় কান্না এসে গিয়েছিল। নানারকম বই পড়ে শোনাচ্ছিলাম আমি, নয়ত মজার মজার গল্প বলছিলাম। বলছিলাম ছোটবেলায় কীরকম ছিলাম আমি, নতুন বল ছুড়ে দিয়েছিলাম মোটরগাড়ির নিচে। গল্পটা সাশার ভারি ভালো লাগল। ভারি ভালো লাগল যে তার বাবাও একদিন ছোট্ট ছিল, দুষ্টুমি করত, কথা শুনত না, শাস্তি পেত। কথাটা মনে ধরল তার। তার পর থেকে যেই কান কটকট করত অমনি সাশা ডাকত, 'বাবা, বাবা, শীগ্‌গির! কান কটকট করছে, বলো-না ছোটবেলায় তুমি কী করতে!' আর ওকে যেসব কথা শুনিয়েছিলাম সেইগুলোই তোমরা এখন পড়বে। গল্পগুলো একটু মজার, মেয়েটির রোগের যন্ত্রণা ভোলাতে হচ্ছিল তো। তাছাড়া লোভ, বড়াই, ন্যাকামি জিনিসগুলো যে কত খারাপ সেটাও মেয়েকে বোঝাতে চেয়েছিলাম বৈকি। তবে ভেবো না যে আমি সারাজীবনই ছিলাম অমনি লোভী, ন্যাকা। খুঁজে খুঁজে শুধু খারাপ ঘটনাগুলোই বলেছি। আর নিজের জীবনে তেমন ঘটনা না পেলে, অন্য কোনও বাবার জীবন থেকে নিলেই-বা কে আটকায়। সবাই তো একদিন ছোটই ছিল। মোট-কথা, গল্পগুলো বানানো নয়, সবই সত্যি।

এখন সাশা বড় হয়েছে। ভোগে সে এখন কম, নিজে নিজেই বড় বড় মোটা মোটা বই পড়ে।

তবে মনে হল, একজনকার বাবা ছেলেবেলায় কী করত সেটা শুনতে অন্য ছেলেমেয়েদেরও ভালো লাগতে পারে।

এইটুকুই আমার বলবার কথা। তবে আরেকটি জিনিস আছে, সেটা বলতে চাই গোপনে। বইটি কিন্তু অসমাপ্ত। তার শেষটা আছে তোমাদের সকলের নিজের নিজের সংসারে। কেননা, প্রত্যেকেরই তো বাবা আছে আর ছোটবেলায় তিনি কী করতেন সেটা সবাই শোনাতে পারেন। পারেন মা-ও। বলতে কি, আমি নিজেই সে গল্প শুনতে ভারি উৎসুক।

এবার তোমাদের সকলের সুখ আর স্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় নিই!

তোমাদের
আ. রাস্কিন

বাবা
যখন ছোটো

বাবা যখন ছোট

রঙিন বল

বাবা যখন ছোটটি, থাকত পাভলভো-পসাদ নামে এক ছোট্ট শহরে, তখন ভারি সুন্দর, মস্ত একটা বল সে উপহার পেয়েছিল। ঠিক যেন সূর্যের মতো বলটা। বলতে কি, সূর্যের চেয়েও সুন্দর। কেননা, সূর্যের দিকে চোখ না-কুঁচকে তো তাকানো যায় না, আর এ বলটাকে চেয়ে দেখতে হলে চোখ কোঁচকাবারও দরকার হত না। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক চারগুণো সুন্দর সূর্যের চেয়ে— কেননা চার রঙে জ্বলজ্বল করত সেটা। আর সূর্যের তো কেবল একটা রঙ, তা-ও চেয়ে দেখা মুশকিল। একটা দিক লেডিকেনির মতো গোলাপি, আরেকটা দিক সবচেয়ে মিঠে চকোলেটের মতো খয়েরি, ওপরটা আকাশের মতো নীল, আর তলটা ঘাসের মতো সবুজ। এমন বল সে শহরে কেউ কখনও দেখেনি। কিনে আনতে হয়েছিল একেবারে খোদ মস্কো থেকে। আর মস্কোতেও তেমন বল কম বলেই আমার ধারণা। দেখতে আসত শুধু ছোটরা নয়, বড়রাও।

'এ একটা বলের মতো বল!' বলত সবাই।

সত্যিই খাসা বল। বাবার ভারি গর্ব ছিল তাই নিয়ে। এমন ভাব করত যেন নিজেই সে বলটা ভেবে ভেবে বানিয়েছে, চার রঙে রাঙিয়েছে। খেলবার জন্যে বলটা নিয়ে গরব করে বেরোলেই ছুটে আসত সব ছেলেরা। বলত :

'বাহ্, কী সুন্দর বল! আয়-না খেলি!'

বাবা কিন্তু বল আঁকড়ে ধরে বলত :

'দেব না! আমার বল! এমন বল কারও নেই! মস্কো থেকে কিনে এনেছে জানিস! সরে যা! আমার বল কেউ ছুঁবি না বলে দিচ্ছি!'

ছেলেরা বলত :

'ইস, কী হিংসুটে দ্যাখ ভাই!'

তা শুনেও বাবা কিন্তু বলটি আর দিত না। খেলত একা একা। তবে একা একা কি খেলা জমে! আর হিংসুটে বাবা কিন্তু ইচ্ছে করেই বলটা খেলত ঠিক ছেলেগুলোর কাছাকাছি, যাতে হিংসে হয় ওদের।

ছেলেরা তখন বলত :

'ভারি কিপটে ছেলেটা। ওর সঙ্গে আমাদের আড়ি!'

দু দিন আড়ি চলল। তিন দিনের দিন ছেলেরা বলল :

'বলটা তোর মন্দ নয়, তা ঠিক। বেশ বড়, খাসা রঙ করা, কিন্তু অত চাল দেখাচ্ছিস কিসের? মোটরগাড়ি চাপা পড়লে যে-কোনও বাজে বলের মতোই ফেটে যাবে।'

'কখখনও ফাটবে না!' গরব করে বলল বাবা, অহঙ্কারে ততদিনে তার মাটিতে আর পা পড়ে না। শুধু বলই নয়, নিজেও যেন সে চার রঙে রাঙা।

'ফট করে ফেটে যাবে রে, ফেটে যাবে!' হেসে উঠল ছেলেরা।

'না ফাটবে না!'

ছেলেরা বলল, 'ওই তো মোটর আসছে। কী, ছুড়ে ফ্যাল দেখি? নাকি ভড়কে গেলি?'

ছোট্ট বাবা বল ছুড়ে দিল গাড়ির নিচে। এক মিনিট আড়ষ্ট হয়ে রইল সবাই। সামনের দুই চাকার তল দিয়ে গলে পেছনের ডান চাকায় ধাক্কা খেল বলটা। খানিকটা কেমন পিছলে গিয়ে বলটা ফেলে এগিয়ে গেল গাড়িটা। কিছুই হল না বলটার।

'ফাটেনি, দেখলি তো, ফাটেনি!' চিৎকার করে বাবা ছুটে গেল বলটার দিকে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই এমন জোর শব্দ হল যেন কামানে তোপ পড়ল। বল ফাটার আওয়াজ আর কি। বাবা গিয়ে দেখল পড়ে আছে ধুলোমাখা রবারের এক ন্যাতা, একেবারেই সুন্দর নয় দেখতে। কেঁদে বাড়ি ছুটল বাবা। ছেলেরা একেবারে আকাশ ফাটিয়ে হাসতে লাগল।

'ফেটেছে! ফেটেছে! যেমন কিপটে, ঠিক হয়েছে তোর!'

বাবা বাড়িতে গিয়ে যখন বলল সে নিজেই অমন সুন্দর বলটা মোটরের তলে ছুড়ে দিয়েছিল, তখন প্রথম চড় খেল ঠাকুমার কাছে। সন্ধ্যায় ঠাকুর্দা কাজ থেকে ফেরার পর আরও একদফা। ঠাকুর্দা বললেন :

'বলটার জন্যে মারছি না, মারছি তোর বোকামির জন্যে!'

অমন সুন্দর বল, গাড়ির তলে ফেলল কী বলে— এই ভেবে এর পরেও অনেকদিন সবাই অবাক হয়ে যেত।

একেবারে নেহাত আহাম্মুক না হলে কি আর কেউ অমন করে।

সবাই জ্বালাত বাবাকে, জিগ্যেস করত :

'কী রে, তোর সেই নতুন বলটি কোথায়?'

হাসাহাসি করেনি কেবল জেঠু। গোড়া থেকে সব ঘটনাটা সে বাবার কাছ থেকে খুঁটিয়ে শুনল। তার পর বলল :

'না, বোকা তুই নোস!'

শুনে ভারি আনন্দ হয়েছিল বাবার।

'কিন্তু ভারি হিংসুটে তুই, অহঙ্কারী,' বলল জেঠু, 'তোর পক্ষে তার ফলটা কখনও ভালো হবে না। নিজের বল নিয়ে যে একা একা খেলতে চাইবে, তার সবই যাবে। সেটা যেমন ছোটদের বেলায়, তেমনি বড়দের বেলাতেও। তোর স্বভাব না বদলালে সারা জীবনই তোর এই হবে।'

তখন ভারি ভয় পেয়ে গেল বাবা, ডাক ছেড়ে কাঁদল, বলল হিংসুটেপনা করবে না সে, জাঁক করবে না। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল বাবা, তাই বাবার কথায় বিশ্বাস করে নতুন বল কিনে দিল জেঠু। সে বল অবশ্যি তত সুন্দর নয়, তবে পাড়ার সব ছেলেই সে বল নিয়ে খেলত। খেলা জমত চমৎকার, বাবাকে কেউ আর হিংসুটে বলে খোঁচাত না।

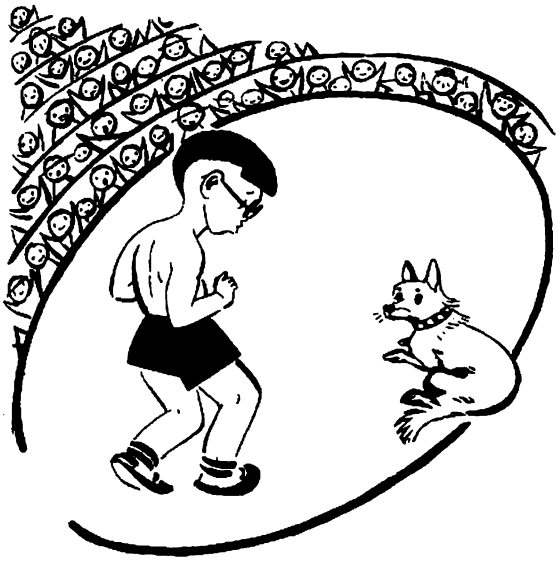

পোষ মানানো

বাবা যখন ছোট, তখন একবার সে যায় সার্কাস দেখতে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব কত কাণ্ডকারখানা। তবে সবচেয়ে তার ভালো লাগত বুনো জন্তুর খেলোয়াড়কে। যেমন সুন্দর তার সাজ-পোশাক তেমনি সুন্দর তার নাম, বাঘ-সিংহ সবাই তার ভয়ে থরহরি। সঙ্গে পিস্তল ছিল তার, হাতে চাবুক, কিন্তু সেগুলো সে প্রায় চালাচ্ছিল না। রঙ্গমঞ্চ থেকে সে ঘোষণা করল :

'জানোয়ারে যে ভয় পায়, সেটা আমার চোখকে! আমার চাউনি— এই হল আমার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। বুনো জানোয়ার মানুষের চাউনি সইতে পারে না!'

সত্যিই, সিংহের দিকে শুধু একবার চাইছে মাত্র, সিংহও অমনি টুলে বসছে, লাফিয়ে যাচ্ছে পিপের ওপর, এমনকি মড়ার মতো শুয়ে পড়ছে, চাউনি ওর সইতে পারছে না।

অর্কেস্ট্রায় ঝঙ্কার উঠল, লোকে হাততালি দিল, সবাই চেয়ে রইল খেলোয়াড়ের দিকে। লোকটা বুকে হাত রেখে চারিদিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল। একেবারে জমজমাট ব্যাপার! বাবারও ইচ্ছে হল সে বুনো জন্তু পোষ মানাবে। ঠিক করল প্রথমে এমন কোনও জন্তুকে চোখ দিয়ে বশ করা যাক, যে তত হিংস্র নয়। বাবা তো তখনও ছোট, বাঘ সিংহের মতো বড় বড় জানোয়ারকে এঁটে ওঠা যে তার

সাধ্যের বাইরে সেটা বাবা জানত। শুরু করা ভালো কুকুর দিয়ে, তা-ও খুব বড় কুকুর হলে চলবে না, কেননা বড় কুকুর মানে তো প্রায় ছোট এক সিংহই। তাই ছোট এক কুকুর হলেই সুবিধা।

শীগ্‌গিরই তেমন একটা সুযোগ মিলল।

ছোট্ট শহর পাভলভো-পসাদ, ছোট্ট একটা পার্কও ছিল সেখানে। এখন সেখানে অবিশ্যি মস্ত এক সংস্কৃতি ও বিরাম উদ্যান, কিন্তু ঘটনাটা যে অনেক দিন আগের। আর ছোট্ট বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এই পার্কে একদিন বেড়াতে গেলেন ঠাকুমা। বাবা খেলছে, ঠাকুমা বই পড়ছেন, একটু দূরে সাজসজ্জা করে বসে আছেন এক মহিলা, সঙ্গে কুকুর। ইনিও বই পড়ছিলেন। কুকুরটা ছোট্ট, সাদা রঙ, বড় বড় কালো চোখ। বড় বড় সেই চোখ দিয়ে যেন ছোট্ট বাবার কাছে মিনতি করছিল কুকুরটা, 'ভারি বশ মানার শখ আমার! এই ছেলে, বশ মানাও-না আমায়। লোকের চাউনি আমি একেবারেই সইতে পারি না!'

ছোট্ট বাবাও অমনি গোটা পার্কটা পাড়ি দিল কুকুরকে বশ করতে। ঠাকুমা বই পড়ছিলেন, কুকুরের গিন্নিও বই পড়ছেন, কেউ সেদিকে নজর করেননি। বেঞ্চির তলে শুয়ে ছিল কুকুরটা, বড় বড় কালো চোখে হেঁয়ালি নিয়ে চেয়ে ছিল ছোট্ট বাবার দিকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল বাবা (তখন তো বাবা খুবই ছোট), ভাবছিল, 'নাহ্, আমার চাউনিতে দেখছি কুকুরটার কিছু হচ্ছে না... সিংহ দিয়ে শুরু করলেই কি তাহলে ভালো হত? কুকুরটা দেখছি বশ মানবে না ঠিক করেছে।'

ভারি গরম পড়েছিল সেদিন, বাবার পরনে হাফপ্যান্ট, পায়ে স্যান্ডাল। এগিয়ে আসছে বাবা, আর চুপ করে শুয়েই আছে কুকুরটা। কিন্তু একেবারে কাছে আসতেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কুকুরটা কামড়ে দিল বাবার পেটে। ভয়ানক হইচই বেধে গেল চারিদিকে। বাবা চিৎকার করছে, ঠাকুমা চিৎকার করছেন, কুকুরের গিন্নিও চিৎকার জুড়েছেন। আর সেইসঙ্গে প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে কুকুর।

বাবা চ্যাঁচাচ্ছে :

'উহুরে, কুকুরে কামড়েছে আমায়!'

ঠাকুমা চ্যাঁচাচ্ছেন :

'ওই মাগো, কুকুরে কামড়েছে ওকে!'

আর কুকুরের গিন্নি চ্যাঁচাচ্ছেন :

'ও কুকুর যে একেবারেই কামড়ায় না! কুকুরকে জ্বালাতন করছিল ছেলেটা!'

আর কুকুরটা যে কী বলছিল সে তো বুঝতেই পারছ।

যত রাজ্যের লোকজন ছুটে এসে চ্যাঁচাতে লাগল :

'কী জঘন্য ব্যাপার! কী জঘন্য ব্যাপার!'

এই সময় পাহারাওয়ালা এসে হাজির হল, জিগ্যেস করল :

'কী রে খোকা, কুকুরটাকে খোঁচাচ্ছিলি?'

'না তো,' বাবা বলল, 'আমি ওকে বশ করছিলাম।'

সবাই হেসে উঠল। পাহারাওয়ালা বলল :

'কিন্তু বশ করছিলি কী দিয়ে?'

বাবা বলল :

'একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছিলাম। দেখছি মানুষের চাউনি ও সইতে পারে না।'

ফের হেসে উঠল সবাই।

মহিলাটি বললেন :

'দেখলেন তো, ছেলেটার নিজেরই দোষ। কে ওকে বলেছিল আমার কুকুরকে বশ করতে? আর আপনাকে,' ঠাকুমার দিকে ফিরে বললেন, 'জরিমানা করা দরকার আপনাকে, ছেলেমেয়েদের সামলে রাখতে পারেন না!'

ঠাকুমা এমনই অবাক হয়ে গেলেন যে কিছুই বললেন না, একেবারে থ' মেরে গেলেন। পাহারাওয়ালা তখন বলল :

'দেখছেন তো, নোটিশ ঝুলছে : কুকুর আনা নিষেধ! যদি নোটিশে থাকত : ছেলেমেয়েদের আনা নিষেধ! তাহলে ছেলের মাকেই জরিমানা করতাম। অতএব এবার আপনাকেই জরিমানা দিতে হবে। সরে পড়ুন কুকুরটি নিয়ে। ছেলেয় খেলছে, কুকুরে কামড়াচ্ছে। খেলা করা এখানে চলবে, কিন্তু কামড়ানো চলবে না! তবে খেলতেও হয় বুদ্ধি করে। কেন তুই কুকুরটার দিকে এগুচ্ছিলি সেটা তো আর কুকুরটা জানে না। বলা তো যায় না, তুই হয়তো কামড়াতেই আসছিস, কুকুরটা তো আর সেটা জানে না, বুঝেছিস?'

বাবা বলল :

'বুঝেছি।' জানোয়ার বশ করার কোনও সাধই আর তখন তার ছিল না। আর পাছে কিছু-আবার একটা হয় এই ভেবে বাবাকে যেসব ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল তার পরে তো বাবার একেবারেই ও পেশায় ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

আর মানুষের দৃষ্টি সইতে পারা না-পারা নিয়ে বাবার তখন একেবারেই অন্য মত। পরে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাবার। দুজনের মতে কোনও গরমিল দেখা যায়নি। মস্ত এক বদরাগী কুকুরের চোখের পাতার লোম ছেঁড়ার চেষ্টা করেছিল সে।

কুকুরটা যে ছেলেটার পেটে কামড় দেয়নি, তাতে কিছু এসে-যায় না, কেননা সঙ্গে সঙ্গেই সে তার দুই গালেই দাঁত বসায়। ছেলেটার মুখের দিকে চাইলেই সেটা দিব্যি বোঝা যায়। তাহলেও ইনজেকশন কিন্তু তার পেটেই দেওয়া হয়েছিল।

পদ্য রচনা

বাবা যখন ছোট, তখন কেবলি পড়ত সে। পড়তে শিখেছিল বাবা চার বছর বয়সে, পড়া ছাড়া আর কিছুতেই ঝোঁক ছিল না তার। অন্য ছেলেরা লাফ-ঝাঁপ ছুটোছুটি করছে, মজার মজার খেলা খেলছে নানারকম, ছোট্ট বাবা কিন্তু তখন বসে আছে তার বইটি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দা-ঠাকুমার দুশ্চিন্তা হল। সারাক্ষণ বই নিয়ে থাকলে ক্ষতি হবে বৈকি। বই উপহার দেওয়া বন্ধ হল, হুকুম হল পড়া চলবে কেবল দিনে তিন ঘণ্টা। তাতে কিন্তু ফল হল না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ছোট্ট বাবার বই পড়া বন্ধ হল না। নিয়মমতো তিন ঘণ্টা বাবা পড়ত লোকের সামনে। তার পর লুকিয়ে যেত। লুকোত খাটের নিচে, সেখানে পড়ত। লুকোত চিলেকুঠরিতে— সেখানে পড়ত। চলে যেত বিচালিগোলায়, সেখানে পড়ত। এই জায়গাটাই ছিল সবচেয়ে ভালো। তাজা বিচালির গন্ধ উঠত সেখানে। ঘর থেকে চ্যাঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসত : সেখানে সবকটি খাটের নিচে ছোট্ট বাবার তল্লাস চলছে। বাবা কিন্তু দেখা দিত ঠিক সন্ধের খাবার সময়। শাস্তি পেতে হত বৈকি। চটপট খেয়ে শুয়ে পড়ত বাবা। রাতে ঘুম ভেঙে আলো জ্বেলে ফের সকাল অবধি পড়ত। পড়ত চুকোভস্কির লেখা 'কুমির', 'পুশকিনের রূপকথা', 'আরব্য রজনীর গল্প,' 'গালিভারের ভ্রমণ', 'রবিনসন ক্রুসো'। আর দুনিয়ায় সুন্দর সুন্দর বই কি আর কম! ইচ্ছে হত সবগুলোকে

পড়ে শেষ করে। দেখতে না-দেখতে কেটে যেত সময়। ঘরে ঢুকতেন ঠাকুমা, বই কেড়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিতেন। কিছুটা চুপচাপ থাকার পর ছোট বাবা ফের আলো জ্বালত, টেনে নিত সমান মনোহর অন্য আরেকটা বই। ঘরে ঢুকতেন ঠাকুর্দা, বই কেড়ে আলো নিভিয়ে বহুক্ষণ শাস্তি দিতেন ছোট্ট বাবাকে।

ব্যথা তত লাগত না বটে, তবে ভারি অভিমান হত।

এর পরিণাম দাঁড়াল খুবই খারাপ। ছোট্ট বাবার চোখ খারাপ হয়ে গেল— খাটের তলে, কি চালের নিচেকার মাচায়, কি বিচালিগোলায় তো আর আলো থাকত না বিশেষ। তাছাড়া শেষের দিকে চালাকিও খাটাত, আগাগোড়া কম্বলমুড়ি দিয়ে এক কোণে একটু ফাঁক রেখে দিত আলোর জন্যে। আর অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে বই পড়া তো খুবই অনিষ্টকর। তাই ছোট্ট বাবাকে চশমা নিতে হল।

তাছাড়া ছোট্ট বাবা কবিতাও বানাত :

বেড়াল দেখলে বলত : — বেড়াল
এ কী তোর খেয়াল!
কুকুর দেখলে বলত : — কুকুর
একটু কর সবুর!
মোরগ দেখলে বলত : — হলদে ঝুঁটি, হলদে ঝুঁটি
বাচ্চা তোর কত কটি?
আর নিজের বাবাকে দেখলে বলত : — বাবা!
লজেঞ্চুস দিবা?

কবিতাগুলো ঠাকুর্দা-ঠাকুমার ভালোই লাগত। টুকে রাখতেন, অন্যদের দিতেন। বাড়িতে কোনও লোক এলে ছোট্ট বাবার ওপর হুকুম হত :

'তোর কবিতা শোনা তো একটা!'

ছোট্ট বাবাও সানন্দে শোনাত তার বেড়াল নিয়ে নতুন কবিতাটা, যার শেষটা এইরকম :

বেড়ালটার সাহস ছিল
জানালা দিয়ে ঝম্পিল!

শুনে সবাই খুব হাসত। কবিতাগুলো যে বাজে তাতে কারও সন্দেহ ছিল না। ও-রকম কবিতা সবাই বানাতে পারে। কিন্তু ছোট্ট বাবার মনে হত কবিতাগুলো অনবদ্য। ভাবত লোকেরা বুঝি হাসছে তার তারিফ করেই। ধরে নিল সে রীতিমতো লেখক হয়ে পড়েছে। যে-কোনও জন্মদিনেই কবিতা শোনাত বাবা। শোনাত ভোজের আগে, ভোজের পরে। লিজা পিসির যখন বিয়ে হল, তখনও কবিতা লিখল একটা। তবে তার পরিণামটা ভালো দাঁড়াল না, কেননা কবিতার শুরুটা ছিল এইরকম :

কেবা ভাবতে পেরেছিল, দেখহ,
লিজা পিসির হচ্ছে কিনা বিবাহ!

এইটুকু শুনেই অতিথিরা ভয়ানক হাসতে থাকে, লিজা পিসি কিন্তু কেঁদে দিয়ে ছুটে পালায় তার নিজের ঘরে। বর না কাঁদলেও হাসে না। বাবাকে অবিশ্যি এর জন্যে শাস্তি পেতে হয়নি। লিজা পিসিকে কোনোরকম অপমানের কোনও ইচ্ছেই বাবার ছিল না। কিন্তু মোটের ওপর বাবা লক্ষ করে দেখল, পরিচিতদের কারও কারও কাছে তার পদ্য আর তেমন ভালো ঠেকছিল না। একবার তো সে নিজের কানেই শুনল একজন আরেকজনকে বলছে :

'ভুন্দেরখেন্দটি এবার ফের ছাইপাঁশ শুরু করবে।'

বাবা তখন ঠাকুমার কাছে গিয়ে জিগ্যেস করে :

'আচ্ছা মা, ভুন্দেরখেন্দ মানে কী?'

ঠাকুমা বলেন :

'তার মানে অসাধারণ ছেলে।'

'কী করে সে?'

'মানে হয়তো বেহালা বাজায় কি মনে মনে অঙ্ক কষে, নয়ত প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মাকে জ্বালায় না।'

'আর যখন বড় হয়?'

'তখন প্রায়ই সে সাধারণ লোক হয়ে দাঁড়ায়।'

শুনে বাবা বলল :

'বুঝেছি।'

পরের জন্মদিনে বাবা আর কবিতা শোনাল না। বলল মাথা ধরেছে। সেই থেকে অনেক দিন সে আর কবিতা লেখেনি। এমনকি এখনও পর্যন্ত জন্মদিনে নিজের কবিতা শোনাতে বললেই বাবার মাথা ধরে ওঠে।

প্রফেসরকে কামড়

বাবা যখন ছোট, তখন ভারি রোগে ভুগত। কেবলি ঠাণ্ডা লাগত। কখনও হাঁচি, কখনও কাশি, কখনও গলায় ব্যথা, কখনও কানে। শেষ পর্যন্ত তাকে যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হল তার দরজায় সাইনবোর্ড লটকানো : 'কান গলা নাক।'

'ওটা কি ডাক্তারের উপাধি নাকি?' ঠাকুর্দা-ঠাকুমাকে জিগ্যেস করল বাবা। ওঁরা বললেন :

'না, কান গলা নাকের অসুখ এখানে দেখা হয়। বেশি বকিস না!'

বাবার কান গলা নাক দেখে ডাক্তার বলল অপারেশন করতে হবে। মস্কোয় এল বাবা। গলার বিচি কাটতে হবে।

ভয়ানক বুড়ো, ভয়ানক কড়া, ভয়ানক পাকাচুলো প্রফেসর বলল :

'খোকা হাঁ করো তো!'

বাবা হাঁ করতেই প্রফেসর ধন্যবাদটুকুও না জানিয়ে সোজা হাত চালিয়ে দিল গলার মধ্যে, একেবারে ভেতর দিকে কী সব টেপাটিপি করতে লাগল। বেশ ব্যথা করছিল, বিশ্রী লাগছিল। তাই 'এ-অ্যাই পেয়েছি এবার বাছাধন' বলে প্রফেসর আরও জোরে টিপুনি দিতেই— চেঁচিয়ে হাত সরিয়ে নিল মুখ থেকে, সে হাত ঢোকবার সময় যেমন আচমকা ঢুকেছিল, বেরুল আরও আচমকা। সবাই দেখল তার বুড়ো আঙুলে রক্ত। একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল সবাই। প্রফেসর বলল :

'আইডিন!'

আইডিন এল, বুড়ো আঙুলে আইডিন লাগাল প্রফেসর। তার পর বলল :

'তুলো ব্যান্ডেজ!'

তুলো ব্যান্ডেজও এল। নিজেই একহাতে বুড়ো-আঙুলে ব্যান্ডেজ করল। তার পর শান্ত গলায় বলল :

'চল্লিশ বছর কাজ করছি, কামড় খেলাম এই প্রথম। যার ইচ্ছে ছেলেটার অপারেশন করুক। ব্যস, আমি চললাম।'

এর পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে চলে গেল প্রফেসর। ঠাকুর্দা তখন ভয়ানক চটে গেলেন বাবার ওপর। বললেন :

'মস্কোয় নিয়ে আসা হল তোকে! তোর রোগ সারাচ্ছে, আর কী লাগিয়েছিস তুই? সাবধান, পাশেই দাঁতের ডাক্তারের ঘর। ডাক্তারকে কামড়ালেই ছেলেদের ওখানে নিয়ে গিয়ে দাঁত তুলে ফেলা হয়। আগে ওখানেই যাবার সাধ হয়েছে বুঝি? এদিকে আমি কিনা আবার ভাবছিলাম অপারেশনের পর আইসক্রিম কিনে দেব তোকে!'

আইসক্রিমের কথা শুনে ভাবনা হল বাবার। আইসক্রিম তো তাকে দেওয়া হত না, সবাই ভয় পেত কানে নাকে গলায় ঠাণ্ডা লাগবে। ওদিকে আইসক্রিমের ওপর বাবার ছিল ভারি লোভ। বাবাকে বলা হয়েছিল, অপারেশনের পর সব ছেলেকেই আইসক্রিম দেওয়া হয়, সেটা নাকি খুবই উপকারী, রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তাতে। সে সময় সত্যি করে তাই করা হত। তাই আইসক্রিমের কথা ভেবে বাবা বলল :

'আর কখনও করব না...'

তাহলেও যে ছোকরা ডাক্তারটি অপারেশন করছিল সে হুশিয়ার করে দিল :

'মনে রাখিস, কথা দিচ্ছিস তো?'

বাবা ফের বলল :

'আর কখনও করব না...'

হেলান চেয়ারে বসিয়ে বাবার হাত-পা চেপে ধরা হল। সেটা কামড়ে দিয়েছিল বলে নয়। সব ছেলেকেই অমনি চেপে ধরা হয়, যাতে ডাক্তারের কাজে ব্যাঘাত না ঘটে। ভারি যন্ত্রণা হচ্ছিল বাবার, কিন্তু আইসক্রিমের কথা ভেবে সব সহ্য করে গেল। শেষকালে ডাক্তার বলল :

'ব্যস! বাহাদুর ছেলে! কাঁদলও না।'

ভারি আনন্দ হয়েছিল বাবার। কিন্তু ডাক্তার বলে উঠল :

'যাহ্, আরও এক টুকরো রয়ে গেছে দেখছি! আরেকটু সইতে পারবি তো?'

'পারব,' বলে বাবা ফের আইসক্রিমের কথা ভাবতে লাগল।

'যাক,' বলল ডাক্তার, 'এবার খালাস! বাহাদুর ছেলে! সত্যিই কাঁদল না দেখছি! এবার আইসক্রিম খেতে পারিস। কোন আইসক্রিম ভালোবাসিস?'

'ক্রিম আইসক্রিম,' বলে বাবা তাকিয়ে দেখল ঠাকুর্দার দিকে, ঠাকুর্দা কিন্তু তখনও রেগে আছেন বাবার ওপর। বললেন :

'বিনা আইসক্রিমেই চলবে! শিক্ষা হোক, কামড়াতে যেন না যায়।'

এতক্ষণে আইসক্রিম পাওয়া যাবে না শুনে বাবা আর পারল না, কেঁদে ফেলল। সবারই মায়া হচ্ছিল, ঠাকুর্দা কিন্তু টললেন না। বাবার এমন অভিমান হয়েছিল যে ঘটনাটা এখনও পর্যন্ত তার মনে আছে। আর তার পর থেকে ক্রিম, চকোলেট, বেরি— কতরকম আইসক্রিম বাবা তো কতবারই খেয়েছে, কিন্তু অপারেশনের পর তখন যে আইসক্রিমটি পাবার কথা ছিল, তা না পাওয়ার দুঃখ বাবার এখনও যায়নি।

এর পর থেকে রোগ কমে গেল বাবার। তেমন হাঁচি নেই, কাশি নেই, গলার ব্যথা এমনকি কানের ব্যথাও তেমন করত না।

অপারেশনে খুবই ভালো ফল দিয়েছিল। বাবা বুঝল, আগে কিছুটা সহ্য করতে পারলে পরে ভালো হয়। এর পর আরও নানারকম ডাক্তার অনেকবার কাটাকুটি করেছে নানারকম, সুঁই ফুটিয়েছে, কিন্তু তার জন্যে আর কখনও কাউকে বাবা কামড়ায়নি। জানত, ওগুলো তারই উপকারের জন্যেই। শুধু কারও ভরসায় সে আর থাকত না, নিজের আইসক্রিমটি কিনে নিত নিজেই। কেননা আজও পর্যন্ত বাবা আইসক্রিম ভালোবাসে খুবই।

পেশা বাছাই

বাবা যখন ছোট, তখন প্রায়ই একটা প্রশ্ন শুনতে হত তাকে। লোকে জিগ্যেস করত: 'বড় হয়ে কী হবি বল তো?' জবাব দিতে বাবার একটুও দেরি হত না। তবে প্রতিবারেই সে জবাব হত আলাদা আলাদা। প্রথম দিকে বাবার ইচ্ছে ছিল রাতের চৌকিদার হবে। ভারি ভালো লাগত যে সবাই ঘুমোচ্ছে, কিন্তু চৌকিদারের ঘুম নেই। তাছাড়া চৌকিদার যে কাঠের হাতুড়ি পিটিয়ে টহল দিয়ে যেত সেটাও ভারি ভালো লাগত তার। সবাই যখন ঘুমুচ্ছে, তখন যে আওয়াজ করা যাবে এতে ভারি আনন্দ লাগত বাবার। পাকাপাকি বাবা ঠিক করে ফেলল যে বড় হয়ে রাতের চৌকিদারই সে হবে। এই সময় সুন্দর একটি সবুজ ঠেলাবাক্স সমেত দেখা দিল এক আইসক্রিম ফেরিওয়ালা। গাড়িও ঠেলা যাবে, আইসক্রিমও খাওয়া যাবে!

'একটা করে আইসক্রিম বিক্রি করব, একটা করে খাব,' বাবা ভাবল, 'আর ছোট খোকাখুকু দেখলে দিয়ে দেব বিনা পয়সাতেই।'

ছেলে আইসক্রিম ফিরি করবে শুনে ছোট্ট বাবার মা-বাবারা ভারি অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে অনেক হাসাহাসি করেছিল তারা। বাবা কিন্তু এই মজাদার সুস্বাদু পেশাটাকে আঁকড়েই রইল মনে মনে। এই সময় হঠাৎ একদিন রেলস্টেশনে এক আশ্চর্য লোক দেখল বাবা। লোকটা সারাক্ষণ কেবল ওয়াগন আর ইঞ্জিন নিয়ে

খেলছে। সে খেলা খেলনা নিয়ে নয়, সত্যিকারের ইঞ্জিন নিয়ে! লাফিয়ে চত্বরে নামছে, ঢুকে যাচ্ছে ওয়াগনের তলায়, অপূর্ব কী এক খেলা চালাচ্ছে।

'কে লোকটা?' জিগ্যেস করল বাবা।

জবাব এল, 'রেলের খালাসি, ওয়াগনের আঙটা লাগায় ও।'

সঙ্গে সঙ্গে বাবা শেষ পর্যন্ত বুঝে নিল কী সে হবে। ভেবে দ্যাখো একবার! ওয়াগনের আঙটা লাগাচ্ছি আর খুলছি! দুনিয়ায় এরচেয়ে চমৎকার আর আছে কিছু? জানা কথা, থাকতেই পারে না। বাবা যখন ঘোষণা করল যে সে রেলের খালাসি হবে, তখন কে যেন জিগ্যেস করেছিল :

'আর আইসক্রিম?'

ভাবনায় পড়ল বাবা। রেলের খালাসি হবে তাতে বাবার কোনও সন্দেহই নেই, কিন্তু আইসক্রিম ভরা সবুজ বাক্সটাও ছেড়ে দিতে মন চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত একটা উপায় বার করল বাবা। ঘোষণা করল :

'খালাসি আইসক্রিমওয়ালা দুই-ই হব!'

ভারি তাজ্জব ব্যাপার, কিন্তু ছোট্ট বাবা বুঝিয়ে দিল :

'তাতে আর মুশকিল কী? সকালে আইসক্রিম নিয়ে বেরুব, ঘুরে ঘুরে তার পর ছুটে যাব স্টেশনে। সেখানে ওয়াগনে আঙটা লাগাব। ফের ছুটে যাব আইসক্রিম নিয়ে। তার পর ফের চলে আসব স্টেশনে। ওয়াগনের আঙটা খুলব, আবার যাব আইসক্রিমে। এই চলবে। গাড়িটা রাখব স্টেশনের কাছেই। আঙটা খোলাখুলির জন্যে বেশিদূর ছোটাছুটি করতে হবে না।'

সবাই খুব হেসে উঠল। ছোট্ট বাবা তখন রেগে গিয়ে জানিয়ে দিল :

'তোমরা যদি হাসাহাসি করো তাহলে বলে দিচ্ছি, রাতের চৌকিদারিও ছাড়ব না। রাত তো আমার ফাঁকা। চৌকিদারি হাতুড়ি ঠুকতেও শিখে গিয়েছি। একজন চৌকিদার আমায় দেখিয়ে দিয়েছে...'

এইভাবেই সব ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু শিগগিরই পাইলট হবার সাধ হল বাবার। পরে ইচ্ছে হল অভিনেতা হবে, থিয়েটার করবে। পরে একবার ঠাকুর্দার সঙ্গে একটা কারখানা দেখতে গিয়ে ঠিক করল টার্নার হবে। তাছাড়াও জাহাজের মাল্লা হবার ইচ্ছে হয়েছিল বাবার। তা না হলে অন্তত সশব্দে চাবুক চালিয়ে একপাল গরু নিয়ে রাখালি করবে। একবার তার জীবনের পরম কামনা হয়ে উঠেছিল কুকুর হবে। সারাদিন সে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াল, লোক দেখে ঘেউ ঘেউ করে ডাকল, একজন বুড়ি তার মাথায় হাত বোলাতে গেলে বাবা কামড়ে দেবারও চেষ্টা করল। কুকুরের ডাকটা বাবার বেশ হত, কিন্তু কুকুরের মতো পা দিয়ে কান চুলকানোটা বাবা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আয়ত্ত করতে পারল না। ভালো করে আয়ত্ত করার জন্যে সে বাড়ির বাইরে গিয়ে তুজিক

কুকুরের পাশেই বসল। রাস্তা দিয়ে তখন অচেনা এক সৈন্য যাচ্ছিল। থেমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বাবাকে দেখল সে, তার পর জিগ্যেস করল :

'কী করছিস রে খোকা?'

'কুকুর হচ্ছি,' বলল ছোট্ট বাবা।

অচেনা লোকটা তখন জিগ্যেস করল :

'মানুষ হতে চাস না বুঝি?'

'মানুষ তো আমি অনেকদিন আগেই হয়েছি!' বলল বাবা।

লোকটা বলল :

'কুকুরই যখন হতে পারছিস না তখন মানুষ আর কোথায় হলি? ওকে কি আর মানুষ বলে?'

'তবে কাকে বলে?' জিগ্যেস করল বাবা।

'তুই নিজেই ভেবে দ্যাখ!' বলে চলে গেল লোকটা। মোটেই ঠাট্টা করেনি সে, এতটুকু হাসেওনি। কিন্তু ছোট্ট বাবার কেন জানি ভারি লজ্জা হল। ভাবতে শুরু করল বাবা। কেবলি ভাবে আর ভাবে, আর যত ভাবে তত লজ্জা হয়। সৈন্যটা তাকে কিছুই বুঝিয়ে বলেনি। কিন্তু নিজেই সে হঠাৎ একদিন বুঝল রোজ রোজ নতুন নতুন পেশার পেছনে ছোটাটা কোনও কাজের কথা নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখনও সে ছোট, কী যে সে হবে সেটা নিজেই সে এখনও জানে না। প্রশ্নটা ফের কেউ তাকে জিগ্যেস করলে সৈন্যের কথাটা মনে পড়ে যেত বাবার। বলত :

'মানুষ হব!'

তাতে কিন্তু কেউ হাসত না। ছোট্ট বাবা বুঝল যে এইটেই সবচেয়ে সঠিক উত্তর। সবার আগে হতে হবে খাঁটি মানুষ। পাইলটই হোক কি টার্নারই হোক, রাখালই হোক কি অভিনেতা হোক— সকলের পক্ষেই সেইটেই বড় কথা। আর মানুষ হলে পা দিয়ে কান চুলকানোর কোনও দরকারই হয় না।

বাজনা শেখা

বাবা যখন ছোট, তখন নানারকম খেলনা কিনে দেওয়া হত বাবাকে। বল। লোটো। দম দেওয়া মোটরগাড়ি। হঠাৎ বাড়িতে কেনা হল পিয়ানো। খেলনা নয়, সত্যিকারের মস্ত এক পিয়ানো, চকচকে কালো তার ঢাকনা। ঘরের আধখানাই জুড়ে গেল তাতে।

ঠাকুর্দাকে জিগ্যেস করল বাবা :

'বাবা তুমি পিয়ানো বাজাতে পারো?'

ঠাকুর্দা বললেন :

'না রে, পারি না।'

তখন ঠাকুমাকে জিগ্যেস করল বাবা :

'আর মা, তুমি বাজাতে পারো?'

'উহুঁ,' ঠাকুমা বললেন, 'পারি না।'

'তাহলে কে বাজাবে?' জিগ্যেস করল ছোট্ট বাবা।

ঠাকুমা-ঠাকুর্দা দুজনেই সমস্বরে বলে উঠলেন :

'তুই!'

'কিন্তু আমিও যে জানি না,' বলল বাবা।

'তুই শিখবি,' বললেন ঠাকুর্দা।

ঠাকুমা যোগ করলেন :

'মাস্টারনির নাম নাদেজদা ফিওদরভনা।'

তখন বাবার খেয়াল হল কত বড় উপহার সে পেয়েছে। আগে তো কখনও মাস্টার রাখা হয়নি তার জন্যে, নতুন নতুন খেলনা যা পেয়েছে তা নিয়ে নিজে নিজেই সে খেলেছে।

বাজনার মাস্টারনি নাদেজদা ফিওদরভনা এলেন। চুপচাপ বয়স্কা মহিলা। কী করে পিয়ানো বাজাতে হয় তা তিনি বাবাকে দেখিয়ে দিলেন। স্বরগুলো শিখিয়ে দিলেন তিনি, সাতটা স্বর : সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি। চট করেই এগুলো মুখস্থ হয়ে গেল বাবার। পদ্ধতিটা এইরকম। কাগজ-পেনসিল নিয়ে বাবা বসে বলত :

'সা— কাক পক্ষীর বাসা,' এই বলে গাছ আঁকত বাবা, গাছের উপর বাসা, বাসায় ছানা, পাশে কাক। 'রে— ঘুম দিচ্ছে কুকুরে।' আঁকত উঠোন, উঠোনে খোপ, খোপের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে কুকুর। এমনি করেই এঁকে যেত : গা— ডুব দি গে যা; মা— কিনে আন পাজামা; পা— গাধা টানছে ধোপা; ধা— সুর চাই সব সাধা; নি— সাত রাজ্যের রানি। এ জিনিসটা বাবার খুবই ভালো লেগেছিল। কিন্তু শিগগিরই বাবা টের পেল যে বাজনা শেখা অত সোজা নয়। বার দশেক করে কেবল একটা স্বরই বাজানো— এতে বিরক্তি ধরে গেল বাবার, এর চেয়ে অনেক ভালো বই পড়া, বেড়ানো, এমনকি কিছুই না করা। সপ্তাহ দুয়েক পরে বাজনায় বাবার এমনই অচ্ছেদ্ধা হল যে পিয়ানোটাকে দু চক্ষে দেখতেই পারত না। নাদেজদা ফিওদরভনা প্রথম দিকে তারিফ করতেন বাবার, এবার তিনি কেবল আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে শুরু করলেন।

'সত্যিই তোর মন লাগছে না বাজনায়?' জিগ্যেস করতেন বাবাকে।

প্রতিবারই বাবা বলত :

'না, মন লাগছে না।' আর ভাবত মাস্টারনি রাগ করে শেখানো বন্ধ করবেন। কিন্তু সেটা আর ঘটল না।

ছোট্ট বাবাকে খুব ধমক দিলেন ঠাকুর্দা-ঠাকুমা। বললেন :

'দ্যাখ তো, কী সুন্দর পিয়ানো কিনে দিলাম তোকে। মাস্টার রেখে দিয়েছি... অথচ বাজনায় তোর মন নেই। লজ্জা করে না?'

ঠাকুর্দা আরও বললেন :

'এখন বলছে গান শিখব না, পরে বলবে ইশকুলে যাব না, পরে বলবে কাজও করব না। এমন আলসেকে ছোট থেকেই কাজের তালিম দিতে হয়! আমার কাছে বাজনা শিখবি তুই!'

ঠাকুমা যোগ করলেন :

'আমায় যদি কেউ অমন ছেলেবেলায় পিয়ানো বাজাতে শেখাত, তাহলে ভাগ্যি মানতাম।'

ছোট্ট বাবা তখন বলল :

'গড় করছি তোমাদের, কিন্তু বাজনা আর আমি শিখছি না।'

নাদেজদা ফিওদরভনা যখন এলেন, দেখা গেল বাবা নেই। সারা বাড়ি খোঁজা হল, রাস্তাঘাট দেখা হল, কিন্তু পাওয়া গেল না কোথাও। আর ঠিক এক ঘণ্টা বাদে খাটের তল থেকে নিজেই বেরিয়ে এল বাবা, বলল :

'বিদায় নাদেজদা ফিওদরভনা।'

ঠাকুর্দা বললেন :

'শাস্তি দেব ওকে!'

ঠাকুমা বললেন :

'আমি ওকে দেব আরও এক দফা!'

বাবা কিন্তু বলে দিল :

'যত খুশি শাস্তি দাও, কিন্তু পিয়ানো বাজাতে আর বলো না।'

বলেই কেঁদে ফেলল। ছোট তো! পিয়ানো বাজাতে কিছুতেই মন চাইছিল না। গানের মাস্টারনি নাদেজদা ফিওদরভনা তখন বললেন :

'বাজনা শুনে লোকের আনন্দ হবার কথা। আমার ছাত্ররা কেউ আমার কাছ থেকে পালিয়ে খাটের তলায় লুকোয় না। পুরো এক ঘণ্টা খাটের তলে শুয়ে থাকতেই যদি ওর বেশি ভালো লাগে, তার মানে বাজনা শিখতে ও চায় না। আর যদি না চায়, জেদ করে লাভ নেই। বড় হয়ে হয়তো নিজেই আফসোস করবে। বিদায়! আমার কাছ থেকে পালিয়ে যারা খাটের তলে লুকোয় না, তাদের কাছেই আমি যাব।'

এই বলে চলে গেলেন। আর আসেননি। ঠাকুর্দা কিন্তু ছোট্ট বাবাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়েননি। ঠাকুমা দেন আলাদা আরেক দফা শাস্তি। তার পর বহুদিন মস্ত পিয়ানোটার দিকে বাবা চাইতেন মুখ ভার করে।

বড় হয়ে বাবা টের পায় যে তার সুরবোধ নেই। একটা গানও সে আজও পর্যন্ত সঠিকভাবে গাইতে পারে না। পিয়ানো বাজানো শিখলেও নিশ্চয় বাজাত খুবই খারাপ।

সত্যি, সব ছেলেমেয়েকেই কি আর পিয়ানো বাজানো শেখাতে হয়।

রুটি ছোড়া

বাবা যখন ছোট, তখন মুখরোচক সবকিছুতেই বাবার ভারি লোভ ছিল। ভারি ভালোবাসত সসেজ। ভালোবাসত পনির। ভালোবাসত কাটলেট, কিন্তু রুটি কিছুতেই পছন্দ হত না, অথচ কেবলি সবাই বলত, 'শুধু শুধু খাস নে, রুটির সঙ্গে খা!'

আর রুটি তো তেমন খেতে ভালো নয়। একদম লোভ হয় না খেতে। ছোট্ট বোকা বাবা তাই ভাবত। চায়ের সময়, কি দুপুরের খাওয়ার সময় রুটি বাবা প্রায় ছুঁতই না। এমনকি রাতের খাবারের সময়ও নয়। পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে গুলি পাকাত সে। ওপরকার চটাগুলো ফেলে রাখত টেবিলেই। রুটি লুকিয়ে রাখত টেবিল-ক্লথের তলায়। মিছে করে বলত, সব রুটিই নাকি তার খাওয়া হয়ে গেছে। মনে মনে বাবা ঠিক করে নিয়েছিল, বড় যখন হবে তখন রুটি সে আর ছোঁবেই না, নিজের ছেলেমেয়েদেরও সে কখনও পীড়াপীড়ি করবে না রুটি খাবার জন্যে। ভাবত :

'আহ্, রুটি বাদ দিয়ে খাওয়া, কী তোফা! কী আছে আজ সকালের খাবার? না, পনির। বিনা রুটিতে পনির খাব! সসেজও খাব বিনা রুটিতে! রুটি ছাড়া দুপুরের খাওয়া কী চমৎকারই-না হবে, রুটি ছাড়া সুপ, রুটি ছাড়া কাটলেট— এই না হলে জীবন! রাতের খাবার— তাতেও রুটি নেই। কাল সকালেও চা খাবার সময় আর রুটি

খেতে হবে না এই কথা জেনে ঘুমুতে যাওয়া, সে যে কী আরাম!' এই ছিল ছোট্ট বাবার স্বপ্ন। ভয়ানক ইচ্ছে হত তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, আরও কত লোকে বাবাকে বলতেন ভুল করছে সে, ফল হত না। বলতেন রুটি খুব উপকারী জিনিস। বলতেন, রুটি খেতে চায় না কেবল খারাপ ছেলেরা, বোকা ছেলেরা। বলতেন, রুটি খাওয়া ছেড়ে দিলে লোকের ব্যারাম ধরে। বলতেন, রুটি না খেলে বাবাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু কিছুতেই রুটি আর বাবার ভালো লাগত না।

একদিন ভয়ঙ্কর এক ব্যাপার হল। ছোট্ট বাবার ছিল এক বুড়ি আয়া। বাবাকে ভারি ভালোবাসত সে, কিন্তু খেতে বসে ঝোঁক ধরলে রেগে যেত ভয়ানক। ঠাকুর্দা-ঠাকুমা বাড়ি নেই। ছোট্ট বাবা ওঁদের ছাড়াই রাতের খাবার খেতে বসেছে, কিন্তু রুটি কিছুতেই ছোঁবে না। আয়া তখন বলল :

'শীগ্‌গির রুটি মুখে তোল বলছি, নইলে কিছুই পাবি না!'

ছোট্ট বাবা বলল :

'রুটি খাব না।'

আয়া বলল :

'খেতেই হবে!'

ছোট্ট বাবা বলল :

'খাব না বলছি!'

বলেই রুটি ছুড়ে ফেলল মেঝেয়। আয়া তখন এমন চটে গেল যে একটা কথাও বলতে পারল না। সে বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা। থমথমে চোখে তাকিয়ে আছে, মুখে কথা নেই।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বলল :

'তুই ভাবছিস, ওটা রুটি না? কী যে তুই ছুড়ে ফেললি জানিস না, বলছি শোন। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একটুকরো রুটির জন্যে সারাদিন হাঁস চরাতাম। একবারকার শীতে আমাদের একেবারেই রুটি ছিল না। আমার ভাই— সে-ও বাচ্চা— না খেয়ে মারা যায়। একটুকরো রুটি থাকলে তখন সে বেঁচে যেত। লেখাপড়া শিখছিস, আর কী করে রুটি আসে সেটা শিখছিস না। এই রুটির জন্যে কত খাটছে লোকে, ফসল ফলাচ্ছে আর তুই কিনা তা মাটিতে ফেলে দিলি! ছি-ছি! তোর মুখ দেখতেও ইচ্ছে করছে না!'

শুতে গেল বাবা, কিন্তু ভালো ঘুম হল না। ভয়ঙ্কর কী সব স্বপ্ন দেখল সে। সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন শুনল, সারাদিন সে একটুকরো রুটিও পাবে না— এই তার শাস্তি। শাস্তি হিসেবে প্রায়ই মিষ্টি বন্ধ হত তার, মাঝে মাঝে দুপুরের খাওয়া বন্ধ, কিন্তু

রুটি বন্ধ জীবনে তার এই প্রথম। এ বুদ্ধিটা আয়ার দেওয়া। খাসা বুদ্ধি। সকালে ছোট্ট বাবা পনির খেল বিনা রুটিতে। ভারি খেতে ভালো। চট করে সবটাই খেয়ে নিলে সে। কিন্তু টেবিল থেকে উঠল বেশ খিদে নিয়েই। রুটি ছাড়া পেট আর ভরে না। দুপুরের খাওয়ার জন্যে তর সইছিল না তার। কিন্তু রুটি ছাড়া কাটলেট খেয়েও কিছু ফল হল না। সারাদিন কেবলি মনে হচ্ছিল রুটি খাই। সন্ধ্যার খাওয়ার সময় ছিল ওমলেট। বিনা রুটিতে একেবারেই মুখে রুচল না সেটা।

সবাই হাসাহাসি করতে লাগল বাবাকে নিয়ে। বলল, সারাবছর নাকি তার রুটি বন্ধ। তাহলেও সকালে অবিশ্যি রুটি দেওয়া হল তাকে। আর কী মিষ্টি সেই রুটি। কেউ কিছু বলল না, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল কীভাবে সে রুটি খাচ্ছে। ভারি লজ্জা হয়েছিল বাবার। সেই থেকে বাবা রুটি খাওয়া ধরে। কখনও আর রুটি ছুড়ে ফেলেনি মেঝের উপর।

বাবার রাগ

বাবা যখন ছোট, তখন কথায় কথায় রাগ হত তার। রাগ করত একসঙ্গে সক্কলের ওপর, আলাদা আলাদা প্রত্যেকের ওপর। যদি বলো : 'এত কম খাস যে?' অমনি রাগ। যদি বলো : 'এত বেশি খাস যে?' তাতেও রাগ।

ঠাকুমার ওপর রাগ হত, কেননা ঠাকুমাকে কী যেন একটা কথা বলতে গিয়েছিল বাবা, কিন্তু ঠাকুমা কাজে ব্যস্ত থাকায় সেদিকে কান দেননি। রাগ করত ঠাকুর্দার ওপর, কেননা ও নিজেই কী একটা জিনিসে ব্যস্ত আর সেই সময় কিনা ঠাকুর্দা ওকে কী একটা বলতে এসেছেন। ঠাকুর্দা-ঠাকুমা যখন নেমন্তন্নে কি থিয়েটারে যেতেন, ছোট্ট বাবা তখন রাগ করত, কাঁদতে বসত। জেদ ধরত ঠাকুর্দা-ঠাকুমা কোথাও যেতে পারেন না, বাড়িতেই থাকবেন। আর নিজেই যখন আবার সার্কাস দেখার ঝোঁক ধরত, তখন তো আরও আকুল হয়ে উঠত তার কান্না। ওকে ঘরে বসে থাকতে বলা হয়েছে বলে রাগ করত। রাগ করত নিজের ভাই ভিতিয়া কাকুর ওপর— ভিতিয়া কাকু নিজেও তখন ছোট্ট, কিন্তু বাবার রাগ হয়ে যেত কারণ বাবার সঙ্গে সে কথা কইত না। কেবল হাসত ভিতিয়া কাকু, আর নিজের পা-টা ধরে চুষত। ভিতিয়া কাকু তখন এতই ছোট যে কেবল একটা কথাই বলত : 'বা-ব্বা-ব্বা...' বাবা কিন্তু তাতেও রাগ করত। যদি পিসি কখনও বেড়াতে আসত, তাহলে পিসির ওপরেও রাগ করত বাবা।

যদি বেড়াতে আসত জেঠু, তাহলে রাগ করত জেঠুর ওপর। যদি জেঠু আর পিসি দুজনেই একসঙ্গে আসত, তাহলে দুজনের ওপরই তার রাগ হত। কখনও মনে হত পিসি ওকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। কখনও মনে হত জেঠু ওর সঙ্গে কথাই কইতে চাইছে না। নয়ত অমনি কিছু একটা ভেবে বসত। কেন জানি ছোট্ট বাবা ভাবত, দুনিয়ায় সে ছাড়া বুঝি আর মানুষ নেই।

বাবার যদি কিছু বলবার ইচ্ছে হয়, তাহলে আর সবাইকে যেন চুপ করে থাকতে হবে। আর যদি চুপ করে থাকার ইচ্ছে হয়, তাহলে কেউ বাবার সঙ্গে যেন কথা না বলে।

বাবা যদি কখনও মিউ মিউ করে বেড়াল ডাকে, কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে, শুয়োর ডাক নকল করে ঘোঁত ঘোঁত করে ওঠে, কোঁকর-কোঁ করে ওঠে মোরগের মতো বা গরুর ডাক ডাকে, তাহলে সবাইকে সব কাজ ফেলে শুনতে হবে কী খাসা ও ডাকতে পারে। ছোট্ট বাবা কিছুতেই এইটে বুঝত না যে ছোট হোক বড় হোক, অন্য লোকেরাও তার চেয়ে কিছু তুচ্ছ নয়। আর কেউ যদি তার কথায় আপত্তি জানাত বা ভর্ৎসনা করত, অমনি রাগ হয়ে যেত বাবার। বাবার কাছে সেটা খুবই অসহ্য। ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ ঘোঁজ করে চলে যেত বাবা।

কারও না-কারও ওপর রাগ, কারও সঙ্গে ঝগড়া আর সবার ওপর অভিমান তার লেগেই থাকত। সকাল থেকে সন্ধে অবধি কেবলি তাকে শান্ত করতে হত, বোঝাতে হত। সকালে চোখ খুলতে না-খুলতেই রাগ হয়ে যেত সূর্যের ওপর, কেননা সূর্যটা তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। তার পর সন্ধে পর্যন্ত সবকিছুর ওপরেই তার রাগ হতে হতে শেষ পর্যন্ত যখন ঘুমত, তখনও স্বপ্নেও কার ওপর যেন ঠোঁট ফোলাত, ঝগড়া করত কারও সঙ্গে। কিন্তু অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলবার সময়টাতেই হত সবচেয়ে খারাপ। ঝোঁক ধরত, যে খেলাটা বাবার ভালো লেগেছে শুধু সেই খেলাটাই খেলতে হবে। খেলত শুধু নিজের পছন্দমতো একদল ছেলের সঙ্গে, বাকিদের সঙ্গে কিছুতেই খেলত না। তর্ক হলে সবসময় বাবার কথাই নাকি ঠিক। সবাইকে টিটকারি দিতে চাইত বাবা, কিন্তু ওকে নিয়ে কারও হাসাহাসি করা চলবে না। শেষ পর্যন্ত সবারই বিরক্ত ধরে গেল। সবাই ছোট্ট বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা শুরু করে দিল। ঘরে বাইরে সর্বত্র। ঘরে বলত :

'চা খাবি? তবে রাগ করিস না বাপু!'

'চল বেড়াতে যাই, তবে দোহাই বাপু, মুখ হাঁড়ি করিস না!'

'রাগ করে বসে আছিস তো, নাকি এখনও রাগ হয়নি?'

'রাগ করতে হয় চটপট করে নে, আমাদের সময় নেই!'

এইসব শুনে তক্ষুনি রাগ হয়ে যেত বাবার। আর বাইরের ছেলেরা তো সোজাসুজিই খেপাত। বলত :

'রাগ করেছে রাগুনী,' অমনি রাগ হয়ে যেত বাবার।

'দ্যাখ, দ্যাখ, ওকে যেই আঙুল দেখাব না, অমনি ওর রাগ হয়ে যাবে।'

বাবাকে যেই আঙুল দেখাত, অমনি রাগ হয়ে যেত বাবার। আর হো হো করে হেসে উঠত সবাই। ছোট্ট বাবাকে অত সহজে খেপানো যায় দেখে ভারি মজা লাগত ছেলেদের। একেবারেই হয়তো জ্বালিয়ে মারত তাকে, কিন্তু দেখে কষ্ট হল একটা ছেলের। বয়সে সে একটু বড়। বলল :

'শোন বলি, রাগ করা ছেড়ে দে। দেখিস তখন কেউ আর তোর পেছনে লাগবে না।'

সে-কথাটা মেনেছিল বাবা, অত বেশি আর রাগ করত না, ছেলেরাও তাকে খেপাত কম। তাহলেও রাগ করা তার এমনি অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে সে অভ্যেস যায় কেবল স্কুলে ভর্তি হয়ে। তা-ও পুরো নয়। এই বিচ্ছিরি অভ্যেসটার জন্যে পড়াশুনা, কাজকর্ম বা লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্বে তার ক্ষতি কম হয়নি। আর ছেলেবেলায় যারা বাবাকে চিনত, তারা এখনও পর্যন্ত বাবাকে খেপাবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। কিন্তু এখন বাবা তাদের ওপর মোটেই রাগ করে না। প্রায় মোটেই রাগ করে না। মানে, তখনকার চেয়ে রাগ করে অনেক কম।

বাবার ভুল

বাবা যখন ছোট, তখন তার পানীয় ছিল দুধ, জল আর ক্যাস্টর অয়েল।

সবচেয়ে উপকারী অবশ্য ক্যাস্টর অয়েল। কিন্তু খেতে ভারি বিচ্ছিরি। ছোট্ট বাবার মনে হত বুঝি ক্যাস্টর অয়েলের চেয়ে বিচ্ছিরি জিনিস দুনিয়ায় নেই। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

একবার গ্রীষ্মকালে বাইরে খেলছে বাবা। দিনটা ভারি গরম। ছোটাছুটি করছিল, তাই ভয়ানক তেষ্টা পেল। বাড়ি ছুটে এল বাবা, কিন্তু বাড়ির লোকেরা তখন সবাই ভারি ব্যস্ত। পিঠেপুলি ভাজা হচ্ছে, টেবিলে ঢাকা পড়েছে, নিমন্ত্রিতদের জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই।

কাচের একটা পাত্র থেকে যে বাবা জল খেতে যাচ্ছে সেটা কারও নজরেই পড়ল না। জল ফুটিয়ে বরাবর ওই কাচের পাত্রটাতেই রাখা হত। বাবার সেটা জানা ছিল। ঢেলে সঙ্গে সঙ্গেই আধ গেলাস খেয়ে নিল বাবা। খেতেই দম বন্ধ হয়ে এল। জলটার অমন দশা কেন সেটা কিছুতেই ভেবে পেল না সে।

ছোট বাবার মনে হল যেন এক জ্যান্ত সজারু গিলেছে। পরে মনে হল জলই বটে ভালো কিন্তু কেমন যেন নষ্ট হয়ে গেছে। ভয়ানক ভয় পেল সে, ভাবল বুঝি মরেই যাবে। তাই আতঙ্কে এমন চ্যাঁচাতে লাগল যে সবাই ছুটে এল।

কাশছে বাবা, দম আটকে আসছে, গলার ভেতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছে সব। রোগীর মতো ছটফট করছে। কিন্তু কী হয়েছে কেউ বুঝতে পারছিল না।

ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠলেন :

'অসুখ করেছে নিশ্চয়!'

ঠাকুর্দা বললেন :

'ঢঙ করছে!'

চ্যাঁচানি শুনে এই সময় ছুটে এল আয়া, সে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল। বলল :

'জল ভেবে খেয়েছে, পাত্রটায় যে ভোদকা ছিল!'

ভোদকার কথা শুনেই সবাই ফের চ্যাঁচামেচি শুরু করল।

'ডাক্তার ডাকো, ডাক্তার!' বললেন ঠাকুমা।

'আচ্ছা করে পিটুনি দাও!' বললেন ঠাকুর্দা।

'বরং কিছু একটা খেতে দাও!' বলল আয়া।

একটা স্যান্ডউইচ খেয়ে বাবা আস্তে করে বলল :

'ভোদকা বোধহয় খুবই উপকারী ওষুধ।'

কিন্তু এই সময় মাথা ঘুরতে লাগল বাবার, মাটির উপর বসে পড়ল।

পরে আর কিছু তার মনে ছিল না। লোকের কাছ থেকে শোনে, সারাদিন নাকি সে ঘুমিয়েছে। সন্ধের দিকে একটু ভালো বোধ হয়। নিমন্ত্রিতরা এসে যখন ভোদকা খাচ্ছিল, তখন খাট থেকে শুয়ে শুয়ে সেটা দেখছিল বাবা। ভারি করুণা হচ্ছিল তার। বাবা তখন ভালোই টের পেয়েছে পরে ওদের কেমন দশা হবে। একজন অতিথিকে তো বাবা বলেই দিল :

'ভারি বিচ্ছিরি জিনিস, খাবেন না!'

সকাল নাগাদ একদম ভালো হয়ে গেল বাবা। কিন্তু ওই কাচের পাত্রটা থেকে আর কখনও সে জল খেত না। আর এখনও ভোদকা দেখলেই কেমন যেন তার বিচ্ছিরি লাগে।

প্রায়ই এই গল্পটা শোনায় বাবা। বলে :

'সেই থেকে মদ আর আমি খাইনি!'

লেখা শেখা

বাবা যখন ছোট, তখন পড়তে শিখে যায় চট করেই। শুধু বলা হত : এই হল 'আ' এই হল 'ব', ওতেই অক্ষর পরিচয় হয়ে যায় তার। ভারি মজার ব্যাপার। বই পড়তে শুরু করল সে, ছবি দেখত। কিন্তু লিখতে চাইত না কিছুতেই। নিব লাগানো কলমটাকে ঠিকমতো ধরতে ইচ্ছে করত না। বেঠিকভাবেও যে ধরবে, সে ইচ্ছেও হত না। ইচ্ছে হত পড়বে, লিখতে ইচ্ছে হত না। পড়াটা ভারি মজার, লেখায়-যে কোনও মজাই নেই।

ছোট্ট বাবার গুরুজনেরা বলল :

'না লিখলে পড়তেও পাবি না!'

আরও বলল :

'আগে দাঁড়ি আঁকা শেখ!'

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ছোট্ট বাবার কানে কেবল এই এক কথা। বাবাও দাঁড়ি আঁকতে লাগল, তবে বড়ই বিতৃষ্ণায়।

আর কী বিচ্ছিরিই-না দেখাত দাঁড়িগুলোকে। কোনোটা বাঁকা-ট্যারা, কোনোটা কুঁজো। কোনোটা একেবারে খোঁড়া। ছোট বাবার নিজের চোখেই খারাপ লাগত দেখতে।

হ্যাঁ, সোজা সোজা দাঁড়ি আঁকা তার হল না। তবে কালির ছোপগুলো হত দারুণ। অমন বড় বড় চমৎকার কালির ছোপ কেউ কখনও ফেলতে পারেনি। সবাই সেটা মানল। অক্ষরগুলো যদি কালির ছোপ দিয়ে হত তাহলে ছোট্ট বাবার হাতের লেখা হত দুনিয়ায় সেরা।

একটা দাঁড়িও তার কখনও সমান হত না। কিন্তু প্রতি পাতায় জ্বলজ্বল করত বড় বড় চমৎকার চমৎকার ছোপ।

সবাই ছি-ছি করত, ধমক দিত, শাস্তিও বাদ যেত না। দু বার তিনবার করে লিখতে হত একই জিনিস। কিন্তু যত লিখত ততই খারাপ হত দাঁড়িগুলো, তোফা দেখাত ছোপগুলোকে।

কিছুতেই বাবা বুঝত না কেন তাকে দাঁড়ি আঁকতে বলে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে। কেননা লোকে তো পড়ে অক্ষরই, দাঁড়ি নয়। তাই অক্ষর আঁকারই ইচ্ছে হত বাবার। কিন্তু লোকে বলত আগে ছোট ছোট দাঁড়ি আঁকতে না শিখলে নাকি অক্ষর আঁকা যায় না। এটা কিন্তু তার বিশ্বাস হয়নি। তার পর বাবা যখন ইশকুলে গেল, সবাই একেবারে অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে কী সুন্দর পড়ে আর কী বিচ্ছিরি হাতের লেখা। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।

তার পর বহু বছর কেটেছে। বড় হয়েছে বাবা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পড়তেই বাবা ভালোবাসে, লিখতে মন চায় না। হাতের লেখা তার এতই খারাপ যে অনেকে ভাবে ঠাট্টা করছে।

আর প্রায়ই লজ্জায় পড়তে হয় বাবাকে।

কিছুদিন আগে ডাকঘরে বাবাকে জিগ্যেস করা হয় :

'কী ব্যাপার, লেখাপড়া বিশেষ করেননি বুঝি?'

রাগ হয়ে গেল বাবার। বলল :

'করব-না কেন, যথেষ্টই করেছি!'

'কিন্তু এটা আপনার কী অক্ষর?'

'এটা উ,' মৃদুস্বরে বলল বাবা।

'উ? এভাবে আবার উ লেখে কে?'

'আমি লিখি...' বাবা বলল আস্তে করে।

সবাই হেসে উঠল।

কালির ছোপ না ফেলে সুন্দর ঝরঝরে হরফে লেখার জন্যে আজকাল কী ইচ্ছেই-না করে বাবার! ঠিক করে কলম ধরার কী সাধই-না হয়! ঠিক করে দাঁড়ি আঁকতে শেখেনি বলে কী আফসোসই-না লাগে! কিন্তু এখন আর উপায় কী। নিজেরই তো দোষ।

ভাইকে ফেলে চম্পট

বাবা যখন ছোট, তখন তার ভাইটি ছিল আরও ছোট।

এখন সে ভাইকে আমরা ডাকি ভিতিয়া কাকু, এখন সে ইঞ্জিনিয়র, নিজেরই এক ছেলে আছে, তারও নাম ভিতিয়া।

তখন কিন্তু ভিতিয়া কাকু ছিল একফোঁটা এক বাচ্চা। সবে হাঁটতে শিখেছে। হামাগুড়ি দেওয়া তখনও ছাড়েনি। কখনও কখনও আবার স্রেফ মাটিতেই বসে পড়ে। তাই একা একা ছেড়ে দেওয়া তাকে চলত না। খুবই সে ছোট।

একদিন ছোট্ট বাবা আর আরও ছোট্ট ভিতিয়া কাকু খেলছে আঙিনায়। মাত্র মিনিট খানেকের জন্যে ওদের একা রেখে গেছে সবাই। আর সেই এক মিনিটের মধ্যেই ফটকের ওধারে গড়িয়ে গেল বল। বলের পেছনে বাবা ছুটল, বাবার পেছনে ভিতিয়া কাকু।

ফটকের পরই ঢিবি নেমে গেছে। ঢিবি বেয়ে গড়াতে লাগল বল, বলের পেছন পেছন নামতে লাগল বাবা। বাবার পেছন পেছন ভিতিয়া কাকু।

ঢিবির নিচে রাস্তা। বলটা সেখানে থামল। বাবা এসে ধরল বলটাকে, ছোট ভিতিয়া কাকুও এসে নাগাল ধরল বাবার।

বলটা সবচেয়ে খুদে হলেও কিছুই হয়নি তার। ছোট্ট বাবা কিন্তু খানিকটা হাঁপিয়ে গিয়েছিল। আর ভিতিয়া কাকুর তো কথাই নেই— হাঁটতে শিখেছে তো সবে! সোজা রাস্তার উপরেই বসে পড়ল সে।

ঠিক সেইসময় রাস্তায় ধুলো উঠতে দেখা গেল, গমগমিয়ে উঠল গান, ঘোড়সওয়াররা আসছে। আসছে তারা জোর ঘোড়া ছুটিয়ে। অনেক দিন আগেকার কথা। সবে তখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে।

ছোট্ট বাবা ভালোই জানত যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তাহলেও ভয় হল তার। বল ছুড়ে ফেলে ভিতিয়া কাকুকে রাস্তাতেই ফেলে রেখে বাড়ি পালাল সে।

ছোট্ট ভিতিয়া কাকু কিন্তু মাটির উপর বসে বসে বল নিয়ে খেলছে। ঘোড়া কি সৈন্যে তার ভয় নেই। বলতে কি, কোনও কিছুতেই কোনও ভয় তার ছিল না। একেবারেই ছোট্ট কিনা।

সওয়ারিরা এগিয়ে এল ভিতিয়া কাকুর কাছে। সবার আগে সাদা ঘোড়ায় চাপা কম্যান্ডার।

'রোখকে!' হাঁক দিল সে, ঘোড়া থেকে নেমে কোলে তুলে নিল ভিতিয়া কাকুকে। লোফালুফি করতে লাগল শূন্যে ছুড়ে, হাসতে লাগল।

'কী রে, কেমন চলছে?' জিগ্যেস করল সে। ভিতিয়া কাকুও হেসে বলটা এগিয়ে দিল তার দিকে। ওদিকে ঢিবি থেকে তখন ছুটে নামছে ঠাকুমা, ঠাকুর্দা আর ছোট্ট বাবা।

ঠাকুমা চ্যাঁচাচ্ছেন :

'ছেলে কোথায় গেল, আমার ছেলে?'

ঠাকুর্দা বলছেন :

'থামো, চেঁচিও না!'

আর ছোট্ট বাবা অঝোরে কাঁদছে।

কম্যান্ডার তখন বলল :

'এই নিন আপনার ছেলে! বাহাদুর ছেলে! ঘোড়া, মানুষ কিছুতেই ভয় নেই!'

কম্যান্ডার শেষবারের মতো ভিতিয়া কাকুকে লোফালুফি করে ঠাকুমার কোলে তুলে দিল। বলটা দিল ঠাকুর্দাকে। আর বাবার দিকে চেয়ে বলল :

'ছুটল হারুণ হরিণ বেগে...'

সবাই হেসে উঠল। তার পর ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল সওয়ারিরা। ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, ছোট্ট বাবা আর খুব ছোট্ট ভিতিয়া কাকু বাড়ি ফিরে এল। ছোট্ট বাবাকে ঠাকুর্দা বললেন :

'হারুণ হরিণ বেগে ছুটেছিল কারণ সে ছিল কাপুরুষ। লেরমন্তভের কবিতার লাইন এটা। ছি-ছি, লজ্জা হওয়া উচিত তোর!'

ভারি লজ্জা হল বাবার।

বড় হয়ে লেরমন্তভের সমস্ত কবিতাই বাবা পড়ে। কিন্তু এই কথাগুলো পড়বার সময় চিরকালই ভারি লজ্জা হত তার।

বাবার সই

বাবা যখন ছোট, তখন তার ভাব হয় একটি মেয়ের সঙ্গে। নাম তার মাশা। সে-ও তখন ছোট। একসঙ্গে দিব্যি খেলত তারা। বালি দিয়ে ভারি সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানাত। কোথাও জল জমে থাকলে জাহাজ ছাড়ত। একসঙ্গে মাছও ধরত সেখানে। আর মাছ কখনও ধরা না পড়লেও ফুর্তি কখনও মাটি হত না।

এই মেয়েটির সঙ্গে খেলতে ভারি ভালো লাগত বাবার। কখনও বাবার সঙ্গে ঝগড়া করত না সে, ঢিল ছুড়ত না বাবার দিকে, ল্যাঙ মারত না। বাবার চেনা ছেলেরা সবাই যদি অমন হত, তাহলে কী ভালোই-না হত। কিন্তু ছেলেগুলো যেন একেবারেই অন্যরকম। মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছে বলে সবাই খেপাত বাবাকে। ছড়া কাটত :

তুলতুল ময়দা
বরকনের সওদা!

জিগ্যেস করত :

'কবে বিয়ে হবে রে?'

মাঝে মাঝে বাবাকে তারা ইচ্ছে করেই খুকি বলে ডাকত। বলত :

'কি রে খুকি এলি নাকি? গেছলি কোথায়?'

ভাবত, মেয়ের সঙ্গে ভাব করলে ব্যাটা-ছেলের মান যাবে।

এতে ভারি রাগ হত বাবার। মাঝে মাঝে কেঁদেও ফেলত।

ছোট্ট খুকি মাশা কিন্তু কেবল হাসত। বলত :

'খেপাচ্ছে খেপাক। কান না দিলেই হল!'

তাই মাশাকে খেপিয়ে কোনও মজা হত না। কেবল ছোট্ট বাবাকেই খেপাত সবাই। মাশার দিকে নজরই করত না তারা।

একদিন এক মস্ত কুকুর ছুটে এল আঙিনায়। কে যেন চ্যাঁচালে :

'ওরে, পাগলা কুকুর!'

সবচেয়ে সাহসী ছেলেরাও যে যেদিকে পারল ভোঁ ভোঁ। বাবা দাঁড়িয়ে পড়ল আড়ষ্ট হয়ে। কাছেই কুকুরটা। মাশা মেয়েটি তখন বাবার কাছে দাঁড়িয়ে খেলনা কোদালটা ছুড়ে মারল কুকুরটার দিকে। বলল :

'যা ভাগ, পালা বলছি!'

সবাই দেখল পাগলা কুকুর ল্যাজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। বুঝলে, কুকুরটা তাহলে পাগলা নয়। নেহাত এমনি পরের আঙিনায় এসে পড়েছে। আর কোনটা পরের ঘর, কোনটা নিজের সেটা কুকুরে ভালোই বোঝে। পরের ঘরে সবচেয়ে বদরাগী কুকুরও মেজাজ দেখায় কম।

ছেলেরা যখন দেখল কুকুরটা খ্যাপা নয়, তখন সবাই ঢিল-লাঠি নিয়ে তাড়া করল তাকে। তার জন্যে অবিশ্যি খুব একটা সাহসের দরকার করে না। কুকুরটাও তা জানত। তাই রাস্তা পর্যন্ত গিয়েই থেমে গেল কুকুরটা, গরগর করে উঠল। ছেলেরা তখন নিজেদের আঙিনায় ফিরে এসে বাবার পেছনে লাগল। বলল :

'সবচেয়ে ভয় পেয়েছিলি তুই। ছুটে যে পালাবি সে সাধ্যিও ছিল না। দুয়ো!'

ছোট্ট বাবা কিন্তু বলে দিল :

'হ্যাঁ, ভয় আমি পেয়েছিলাম তা মানছি, তোরাও পেয়েছিলি। ভয় পায়নি কেবল মাশা।'

ছেলেগুলোর মুখে তখন আর কথাটি নেই। লজ্জায় মরে সবাই। কিন্তু মাশা বলল :

'উহুঁ, আমারও ভয় হয়েছিল।'

শুনে হেসে উঠল সবাই। এরপর থেকে ছোট্ট বাবাকে কেউ আর কখনও খেপায়নি। মাশার সঙ্গে অনেকদিন ভাব ছিল বাবার।

শক্তি পরীক্ষা

বাবা যখন ছোট, তখন তার সঙ্গী-সাথি ছিল অনেক। রোজ সবাই খেলত একসঙ্গেই। ঝগড়া হত কখনও কখনও, মারামারিও বাদ যেত না। পরে আবার মিটে যেত। শুধু একটা ছেলে কখনও মারপিট করত না। নাম ছিল তার লিওনিয়া নাজারভ। দেখতে বেঁটে, কিন্তু বেশ শক্ত-সমর্থ। বাপ ছিল তার বুদিওন্নির ঘোড়সওয়ার দলে। সেমিওন মিখাইলভিচ বুদিওন্নির গল্প করতে ভারি ভালোবাসত ছেলেটা। বলত কীরকম লড়াই করত সে সাদাদের সঙ্গে, কিছুতেই ভয় পেত না, জেনারেলই হোক কি কর্নেলই হোক, গুলিই হোক কি তলোয়ারই হোক— কিছুর পরোয়া করত না বুদিওন্নি। কেমন ছিল বুদিওন্নির ঘোড়া, কেমন তার কৃপাণ, সবই জানা ছিল লিওনিয়ার। বলত :

'বড় হয়ে ঠিক বুদিওন্নির মতো হব!'

ছোট্ট বাবা প্রায়ই যেত লিওনিয়ার কাছে। ভারি ফুর্তিতে কাটত সেখানে। ঘরে ওদের কাজ অনেক : রুটি কিনতে ছুটত লিওনিয়া, কাঠ ফাড়ত, মেঝেয় ঝাঁট দিত, বাসন ধুত। ছোট্ট বাবা বেশ দেখত যে বাড়ির সবাই খুব ভালোবাসে লিওনিয়াকে। লিওনিয়ার বাপ প্রায়ই এমনভাবে লিওনিয়ার মত চাইত যেন লিওনিয়া এক বড়সড়ো মাতব্বর মানুষ :

'লিওনিয়া, তাহলে রোববারে কাকে নেমন্তন্ন করা যায়?'

'কাঠের অবস্থা কীরকম রে লিওনিয়া, বসন্ত পর্যন্ত টেনে-বুনে চলবে?'

আর ঠিকঠাক জবাব দিতে লিওনিয়ারও দেরি হত না।

লিওনিয়াদের বাড়িতে কেউ গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে টেবিলে বসিয়ে খাবার এগিয়ে দেওয়া হত। তার পর খেলা শুরু হত সবাই মিলে। ছোট্ট বাবার ভারি আফসোস হত যে তার নিজের বাড়িতে অমন ভালো ফুর্তি জমে না। লিওনিয়ার সঙ্গে তাই ভারি ভাব ছিল তার। তবে একটা জিনিস বাবা ভেবে পেত না; কেন কখনও মারামারি করে না লিওনিয়া। প্রায়ই তাকে বাবা জিগ্যেস করত :

'আচ্ছা তুই মারপিট করিস না কেন বলত? ভয় পাস?'

লিওনিয়া জবাব দিত :

'নিজেদের লোকেদের সঙ্গে মারামারি করে কী হবে?'

একবার ছেলেরা সবাই জুটে তর্ক করছিল কার গায়ে জোর বেশি। কেউ বলে :

'বড় ছেলেদেরও আমি ভয় পাই না। আর তোদের সবাইকে তো একেবারে বেড়াল-ছোড়া করে ছুড়ে ফেলে দেব। দেখেছিস কেমন মাসল্— এই দ্যাখ!'

কেউ বলে :

'আমার গায়ে যা জোর না, নিজেই থ' মেরে যাই মাইরি। বিশেষ করে আমার বাঁ হাতটা। একেবারে লোহার মতো।'

কেউ আবার বলে :

'এমনিতে আমার তেমন জোর নেই, তবে একবার যদি খেপে উঠি, তাহলে সাবধান! কী যে করে বসব বলা যায় না।'

ছোট্ট বাবা বলল :

'তর্ক আবার কী। জোর আমার গায়েই বেশি, জানা কথা।'

সবাই বড়াই করছে। লিওনিয়া নাজারভ কিন্তু চুপ করে শুধু শুনছে, কিছুই বলছে না। একটা ছেলে তখন বলল :

'বেশ কুস্তি হয়ে যাক। যে সবাইকে হারাতে পারবে, তার গায়েই জোর বেশি।'

রাজি হয়ে গেল সবাই। শুরু হয়ে গেল লড়াই। সবাই চাইছিল লিওনিয়া নাজারভের সঙ্গে লড়তে— ও তো কখনও মারামারি করত না, তাই সবাই ভাবত ছেলেটা দুবলা।

প্রথমে লড়তে চায়নি লিওনিয়া, কিন্তু যে ছেলেটির বাঁ হাতখানা লোহার মতো সে যখন লিওনিয়াকে জাপটে ধরল, তখন রেগে উঠল লিওনিয়া, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে একেবারে চিৎ করে ঠেসে ধরলে। তার পর বেড়াল-ছোড়া করে সবাইকে ছুড়ে ফেলার হুমকি যে দিয়েছিল, তাকে ছুড়ে ফেলল লিওনিয়া। যে ছেলেটি খেপে উঠলে কী হয় বলা যায় না, তাকে কাবু করতে লিওনিয়ার এতটুকু দেরি হল না। ছেলেটা অবিশ্যি

চিৎ হয়েও তখনও চিৎকার করছিল যে ঠিকমতো খেপে ওঠার ফুরসুত সে পায়নি, কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে লিওনিয়া ধীরেসুস্থে ছোট্ট বাবাকে ধরাশায়ী করল। বন্ধুত্বের খাতিরে ভাব করল যেন বাবাকে চিৎ করাই সবচেয়ে কঠিন।

সবাই তখন বলল :

'সে কি রে লিওন্‌কা, তোর গায়েই দেখছি জোর বেশি! তাহলে চুপ করে ছিলি যে?'

হেসে লিওনিয়া বলল :

'না তো কী, বড়াই করব?'

ছেলেরা কোনও জবাব দিল না। কিন্তু গায়ের জোর নিয়ে বড়াই তারা আর করত না। বাবাও সেই থেকে বুঝল : বড়াই করলেই জোর হয় না। লিওনিয়া নাজারভের সঙ্গে ভাব তার বেড়ে উঠেছিল আরও।

অনেকদিন কেটে গেছে। ছোট্ট বাবা বড় হয়েছে। অন্য শহরে উঠে যায় বাবা। লিওনিয়া এখন কোথায় বাবা তা জানে না। তবে সে যে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই।

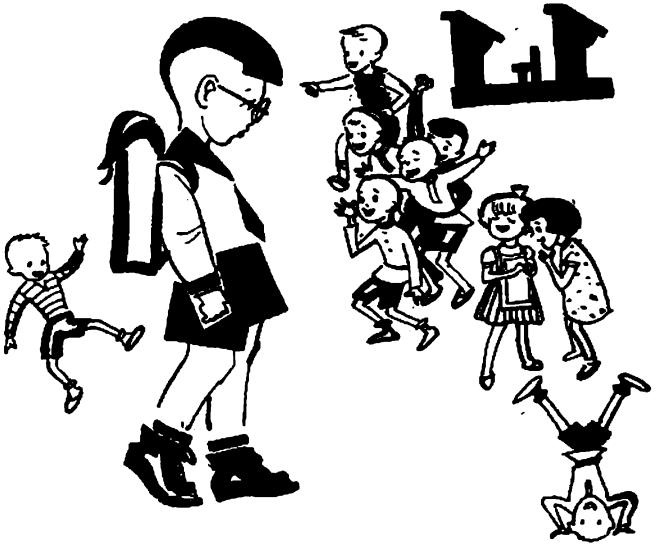

ইশকুল যাত্রা

বাবা যখন ছোট, তখন ভারি ভুগত সে। বাচ্চাদের যত রোগ হওয়া সম্ভব তার একটিও বাদ দেয়নি বাবা। হামে ভুগেছে বাবা, হুপিংকাশিতে, মাম্পসে। প্রতিটি রোগের পর দেখা দিয়েছে আরও নানা উপসর্গ। আর সেসব কাটতেই শুরু হয়েছে নতুন আরেকটা রোগ।

যখন ইশকুলে ভর্তি হওয়ার সময় হল, তখনও বাবা রোগে শয্যাশায়ী। অসুখ সেরে যখন প্রথম পড়তে গেল, অন্য ছেলেদের ততদিনে অনেক জানা হয়ে গেছে। সবাই সবাইকে চেনে, ইশকুলের দিদিমণিও সবাইকার নাম জানেন। ছোট্ট বাবাকে কিন্তু কেউই চেনে না। সবাই কেবল তাকিয়েই আছে তার দিকে। ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার সেটা। তাতে আবার কেউ কেউ জিভ বার করে ভেংচিও কাটল।

লেঙ্গি মারল একটা ছেলে। পড়ে গেল বাবা, কিন্তু কাঁদল না। উঠে দাঁড়িয়ে বাবাও ধাক্কা দিল ছেলেটাকে। সে-ও পড়ে গেল। তার পর উঠে সে-ও ধাক্কা দিল বাবাকে। আবার পড়ে গেল বাবা, এবারেও কাঁদল না। ধাক্কা দিল ছেলেটাকে। এইভাবে বোধহয় গোটা দিনটাই ধাক্কাধাক্কি চলত। কিন্তু ঘণ্টি বেজে উঠল। সবাই ক্লাসে ঢুকে বসে পড়ল নিজের নিজের জায়গায়। কিন্তু ছোট্ট বাবার নিজস্ব কোনও জায়গা ছিল না। তাকে বসানো হল একটা মেয়ের পাশে। তাতে ক্লাস-সুদ্ধ সবাই হাসতে শুরু করে দিল। মেয়েটা পর্যন্ত হেসে উঠল।

তখন ভারি কান্না পেয়েছিল বাবার। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন মজা লাগল, বাবাও হাসতে শুরু করে দিল। দিদিমণিও তখন হাসতে হাসতে বললেন :

'সাবাস, এই তো চাই! আমি ভাবছিলাম বুঝি কেঁদে ফেলবি।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' বলল বাবা।

তাতে আবার হাসি শুরু হল আরেক দফা। দিদিমণি বললেন :

'শোনো সবাই, যখন কান্না পাবে, তখন কিন্তু হেসে ওঠার চেষ্টা করো। এই আমার উপদেশ, সারাজীবন মেনে চলবে! এবার এসো, পড়াশুনা করা যাক।'

ছোট্ট বাবা সেদিন শুনল যে ক্লাসে সবার চেয়ে তার পড়াটাই ভালো। কিন্তু হাতের লেখাটা যে তার সবার চেয়েই খারাপ সেটাও সেই দিনই সে জানল। আর যখন দেখা গেল পড়া চলার সময় সবচেয়ে বেশি গোলমালও বাবাই করে, তখন দিদিমণি আঙুল তুলে ধমকে দিতে ভুললেন না।

ভারি সুন্দর দিদিমণি ছিলেন ইনি। যেমন কড়া, তেমনি হাসি-খুশি। ওঁর কাছে পড়তে ভারি ভালো লাগত সবার। আর তাঁর উপদেশটা বাবা সারাজীবন মনে করে রাখে। ইশকুলে বাবার সেই তো প্রথম দিন। আর তেমন দিন আরও কতই-না এসেছে পরে। ছোট্ট বাবার ইশকুল জীবনের ভালো-মন্দ, হর্ষ-বিষাদে ভরা আরও কত কাহিনী! কিন্তু সে তো আরও একটা বইয়ের ব্যাপার।

ইশকুলে বাবা

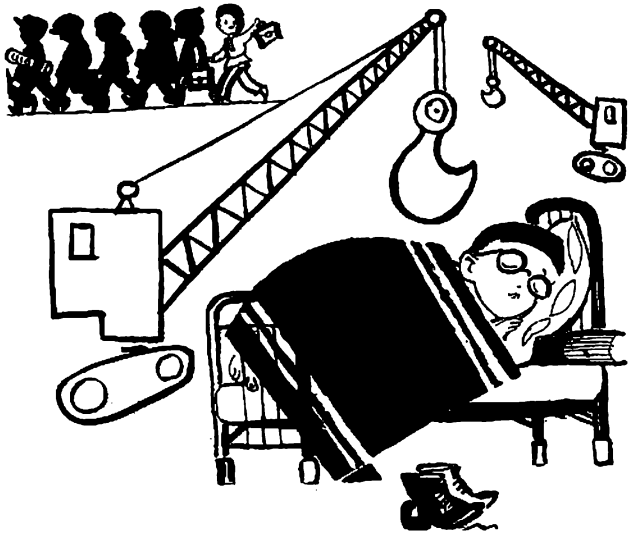

লেট লতিফ

বাবা যখন ছোট, তখন সব ছেলেমেয়ের মতোই ইশকুলে যেত বাবা।

কিন্তু সবাই আসত পড়া শুরুর আগে। আর ছোট্ট বাবা আসত দেরি করে। কখনও কখনও এসে পৌঁছতে দ্বিতীয় ঘণ্টাও বেজে যেত। ভয়ানক অবাক লাগত দিদিমণির। বলতেন, এমন ছেলে এ ইশকুলে তিনি আর দেখেননি। হেডমাস্টার বলতেন, অমন ছাত্র অন্য ইশকুলেও সম্ভব নয়।

বলতেন, 'ঘড়িগুলোর মতোই এ ছেলেটার নির্ঘাত স্লো যাওয়াই অভ্যেস! ওর মা-বাপেরাও কিছু করে উঠতে পারছে না। আমি দু-বার ডেকে পাঠিয়েছিলাম।'

সত্যিই ছোট্ট বাবার মা-বাবারা কিছুতেই পেরে উঠছিলেন না। রোজ সন্ধেয় সেই একই কাহিনী।

'ইশকুলের পড়া করলি?' জিগ্যেস করতেন ঠাকুমা।

'এই যে...এক্ষুণি...' বলত বাবা।

'গল্পের বই বন্ধ করে পড়া করতে বস!' বলতেন ঠাকুর্দা।

'এই বসছি... শুধু এই পাতাটা শেষ করে নিই,' বলত বাবা।

এবং সে পাতাটা শেষ করে পরের পাতায় চলে যেত বাবা। অমন মন-কাড়া গল্প ফেলে নীরস ইশকুলের পড়ায় বসা একেবারেই অসম্ভব লাগত বাবার কাছে।

'বই রেখে দে বলছি!'

'এই যে... একটুখানি...'

'রেখে দে বলছি...'

'এই... একটু...'

শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দা-ঠাকুমার ধৈর্য টুটত। ছোট্ট বাবার বই কেড়ে নিতেন তাঁরা। বলতেন :

'বড় হবি যে একেবারে কুড়ের বাদশা হয়ে!'

ভারি রাগ হয়ে যেত বাবার। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে বই ফেরত চাইত বাবা। বলত, বই না দিলে ইশকুলের পড়াও সে করবে না।

এই করেই সন্ধে কেটে যেত। শেষ পর্যন্ত যখন ইশকুলের পড়া নিয়ে সত্যি করেই বসত বাবা, তখন চোখ জড়িয়ে আসত ঘুমে। ঘুম ভাঙিয়ে দিলে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। আবার জাগা, আবার ঘুম। পড়া যা হত তা কেমন খানিকটা আধো ঘুমের মধ্যে। এই করেই গড়িয়ে আসত রাত। শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দা-ঠাকুমা হয়রান হয়ে নিজেরাই ঘুমিয়ে পড়তেন।

সকালে শুরু হত অন্য আরেক ইতিহাস।

'উঠলি!' বলতেন ঠাকুমা।

'এই যে...' বিড়বিড় করত ছোট্ট বাবা।

'কই, উঠলি!' হাঁক দিতেন ঠাকুর্দা।

'এই উঠছি...'

'ওঠ বলছি!'

'এই যে...'

'ইশকুলে দেরি হয়ে যাবে যে!'

'এই যে... উঠছি...'

'দেরি হয়ে গেছে কিন্তু...'

'এই যে...'

বেশি রাত করে শুলে সকালে ওঠা যে কী কঠিন তা সবাই জানে। ঠিক ওই সময়টিতেই ভারি মিষ্টি হয়ে ওঠে ঘুম। বিশেষ করে যদি আবার উঠেই স্কুলে যেতে হয়।

বাবা যতক্ষণে ধীরেসুস্থে উঠে, ধীরেসুস্থে পোশাক পরে, ধীরেসুস্থে মুখ-হাত ধুয়ে, ধীরেসুস্থে চা খেয়ে, ধীরেসুস্থে খাতাপত্র গোছাত, ততক্ষণে অনেক সময়ই কেটে যেত। তার পরই পড়িমরি ছুটত ইশকুলে, রাস্তার সবকটি ঘড়ির দিকে চাইত আতঙ্কে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বাবাকে ক্লাসে ঢুকতে দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ত ছাত্ররা। দিদিমণিও হেসে উঠতেন :

'এই যে আমাদের লেট লতিফ এসে গেছে!' শুনে ভারি অপমান লাগত বৈকি।

ইশকুলের দেয়াল পত্রিকায় ছোট্ট বাবার ছবি বেরুত : বিছানায় শুয়ে প্রচণ্ড ঘুম দিচ্ছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তার মা-বাবা। দুই বালতি ঠাণ্ডা জল ঢালা হচ্ছে তার মাথায়। মস্ত একটা এলার্ম ঘড়ি ঝনঝনিয়ে বাজছে তার কানের কাছে। অন্য কানে শিঙা ফুঁকছে কোনও একটা ছেলে। তলে লেখা আছে : 'খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ল...' খুবই অপমান লাগত বৈকি। কিন্তু ফের দেরি হয়ে যেত বাবার।

ইশকুলের পড়া যা করবার তা করত একেবারে শেষ মুহূর্তটিতে, ফলে সবই হত দায়সারা গোছের। ইশকুলে দেরি হওয়ায় দিদিমণি যেসব জিনিস বুঝিয়ে দিতেন তা শোনা হত না। এতে ব্যাঘাত হত পড়াশুনায়।

তাছাড়া দেরি হওয়ায় অনবরত তাড়াহুড়া, ছোটাছুটি, ছটফট করতে হত। তাতে স্বভাবের ওপর ফল ফলত খারাপ। তাহলেও দেরি করা তার গেল না।

আমার অবিশ্যি খুবই ইচ্ছে হচ্ছে বলি যে ছোট্ট বাবার মা-বাবারা শেষ পর্যন্ত কী একটা ফন্দি বার করল, দেরি করার অভ্যেস তার কেটে গেল।

ইচ্ছে হচ্ছে বলি, ইশকুলের মাস্টাররা-ছাত্ররা ছোট্ট বাবাকে নিয়ে এমন ঠাট্টা করতে লাগল যে বাবার ভারি রাগ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন সে ইশকুলে হাজির হল সব্বারই আগে, তার পর থেকে আর কখনও সে দেরি করেনি।

কিন্তু কী দরকার মিথ্যে কথা বানিয়ে।

সারাজীবনই সব জায়গাতেই দেরি হয়ে যেত বাবার। ইশকুলে আসত দেরি করে। কলেজে ঢুকেও দেরি করা তার গেল না। যখন চাকরি করছে তখনও সেই দেরি। সবাই হাসত তাকে দেখে। শাস্তি পেতে হত। ভর্ৎসনা-ধিক্কার কিছুই বাদ যায়নি। এই বদ-অভ্যাসটির জন্যে জীবনে তার লোকসানও গেছে অনেক কিছু। কোথাও নেমন্তন্নে গেলে কখনোই সময়মতো যেতে পারত না বাবা। ফলে লোকে ভারি রাগ করত, কখনও কখনও বলেই দিত, অত দেরিই যদি হয় তাহলে দয়া করে নাই-বা এলেন। কোনও একটা কাজে যাবার কথা, এতই দেরি হল যে কাজটি পণ্ড হল।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে নববর্ষ উৎসব পৌঁছতে পৌঁছতেই রাত বারোটা বেজে নতুন বছর শুরু হয়ে গেছে পথের মধ্যেই। কত লোককেই-না বাবা মুশকিলে ফেলেছে!

বাবার চেনা-পরিচিতরা বাবাকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করে কত ঠাট্টার কাহিনীই বলে... কিন্তু আজও পর্যন্ত বাবা রাস্তায় কখনও ধীরেসুস্থে হাঁটতে পারে না। সর্বদাই তার তাড়া। কোথাও না-কোথাও দেরি হয়ে যাওয়াই তার অভ্যেস। এমনকি রাতেও স্বপ্ন দেখে কোথায় যেন তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই চমকে গোঙিয়ে ওঠে।

কখনও কখনও স্বপ্ন দেখে ফের যেন ছোট হয়ে গেছে বাবা। ফের যেন ইশকুলে যাচ্ছে। ফুর্তি করে ইশকুলের ঘড়ি দেখছে বাবা। আগেই এসে গেছে সে! স্বপ্ন দেখছে যেন দেরি হয়নি। সবাই তাকে বাহবা দিচ্ছে। হেডমাস্টার ফুল উপহার দিলেন তাকে। ইশকুলের হলঘরে টাঙানো হয়েছে তার ছবি। অর্কেস্ট্রায় ঝঙ্কার উঠছে। আর ঠিক এই সময়টিতেই চিরকাল ঘুম ভেঙে যায় তার। মনে হয় এবার থেকে আর কখনও তার দেরি হবে না। কিন্তু সে তো শুধু মনে হওয়া।

বাবার সিনেমা দেখা

বাবা যখন ছোট, তখন অনেকদিন পর্যন্ত সিনেমা দেখার সুযোগ হয়নি তার। সবাই বলত, 'এখনও তোর দেখবার মতো বয়স হয়নি... পরে দেখবি। মোটেই ভালো জিনিস নয়।'

এই কথা বলতেন ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা। পিসি আরও ফোড়ন দিতেন, 'সিনেমা হল এক ছোঁয়াচে রোগ। ঠিক একেবারে হাম রোগ, স্কার্লেট জ্বর, হুপিংকাশি... ডিপথিরিয়ার কথা নয় বাদই দিলাম...'

এবং ডিপথিরিয়া নিয়ে অনেক বৃত্তান্ত শোনাতেন পিসি। সিনেমায় যাবার জন্যে কত কাকুতি-মিনতি করত বাবা। বলত তার বন্ধুরা সবাই সিনেমায় যায়, কারও হাম, কি স্কার্লেট জ্বর, কি হুপিংকাশি হয়নি, ডিপথিরিয়ার কথা নয় বাদই যাক। কিন্তু কোনও ফল হল না। সেই একই জবাব শুনতে হত :

'যখন ইশকুলে-ভর্তি হবি তখন তো আর উপায় থাকবে না। তখন আর কে আটকাবে। তখন যাস যত খুশি।'

ছোট বাবার সিনেমা দেখার সাধ মেটাতে হত চেনা ছেলেদের অভিনয় দেখে। ছেলেরা তাকে নকল করে দেখিয়ে দিত কীভাবে 'জেরোর চিহ্ন' নামে এক বিখ্যাত ছবিতে কী চমৎকার লাফ দিচ্ছে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, কী দারুণ তলোয়ার চালাচ্ছে,

হঠাৎ কীভাবে কালো মুখোশ পরে এসে হারিয়ে দিচ্ছে সমস্ত লোককে। ছড়ি হাতে চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় নকল করত তারা, নকল করত মজাদার ইগর ইলিনস্কি, রোগা-ঢ্যাঙা পাত আর বেঁটে-মোটা পাতাশনকে। অভিনয়গুলো তারা করত একেবারে মন-প্রাণ ঢেলে, যা দেখানো সম্ভব সবই দেখাত। নামকরা কাউ-বয় উইলিয়ম হার্টকে নকল করে জড়াজড়ি করে লুটোত তারা।

বড়দের কথাও কানে যেত বাবার। মেরি পিকফোর্ডের হাসি নিয়ে তারা মন্তব্য করত, 'অপূর্ব!'

'বল তো, কীরকম হাসি?' বন্ধুবান্ধবদের জিগ্যেস করত ছোট্ট বাবা। 'বরফ গলার দিন' ছবিতে অভিনেত্রী মেরি পিকফোর্ড কীভাবে হেসেছিল সেটা অভিনয় করে দেখাল একটা ছেলে। খুব প্রাণ ঢেলেই সে দেখাল, সমস্ত ছেলেরাও একমত হয়েই বলল যে তার হাসিটা বলতে কি মেরি পিকফোর্ডের চেয়েও ভালো হয়েছে। তাছাড়া মেরি পিকফোর্ড তো কত বছর ধরে হাসছে, তার জন্যে আবার টাকাও পায়। আর এ ছেলেটা হাসল এই সবে দ্বিতীয় দিন, তা-ও বিনা পয়সায়, বন্ধুকে আনন্দ দেবার জন্যে।

ছোট্ট বাবা টের পেত যে সবাই তার জন্যে যথাসাধ্য সবই করছে। কিন্তু তাতে করে সিনেমা দেখার ইচ্ছেটাই তার আরও বেড়ে উঠত।

তার পর সে শুভদিন সত্যিই এল। ইশকুলে ভর্তি হল বাবা। আর প্রথম রবিবারেই ইশকুলের দিদিমণির সঙ্গে গোটা ক্লাস গেল ছেলেদের বিশেষ শো'য়ে সিনেমা দেখতে। ফিল্মটার নাম 'লাল দত্যি', ছোট্ট বাবা বইটা আগেই পড়েছিল। সেই বইয়ের কিশোর সব সন্ধানীবীর, মহা ভয়ঙ্কর মাখনো সর্দার, আর আশ্চর্য আশ্চর্য সব ঘটনাগুলো দেখবার জন্যে মুখিয়ে ছিল বাবা।

ছোট্ট বাবার বাড়ি থেকে সিনেমাটা বেশি দূরে নয়। বাবার ছোট ভাই ভিতিয়া কাকু পর্যন্ত সিনেমাটা চিনত। তাই গুটিগুটি সিনেমায় সে এসে হাজির হয়ে যায় বাবার আগেই এবং ক্লাসের সমস্ত ছেলেদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে বসে। পটিয়ে নেয় দিদিমণিকে পর্যন্ত। হঠাৎ সেখানে ছোট ভাইকে দেখে ছোট্ট বাবা কিছুই বলল না, শুধু তার কান মলে বাড়ি পাঠাতে চাইল। ছোট্ট ভিতিয়া কাকু তাতে এমনি কান্না জুড়লে যে মুখ থেকে তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনটি লজেন্স বেরিয়ে এল। বাবার ক্লাসের মেয়েরা সবাই ছেঁকে ধরে লজেন্স দিয়েছিল তাকে। ভিতিয়া কাকুও ভারি সুবোধ ছেলে। কেউ লজেন্স দিলে সে কখ্খনও আপত্তি করে না।

এমন আকুল কান্না শুরু করল ভিতিয়া কাকু যে সারা ক্লাস তার পক্ষ নিল। দিদিমণি পর্যন্ত বলে দিলেন, 'থাক, আসুক আমাদের সঙ্গে। আমি জিম্মা নিলাম।'

তা শুনে ছোট ভাইয়ের কান ছেড়ে দিল বাবা। সবাই ঢুকল সিনেমা হলে। ঘণ্টি বাজল। শিশুদের জন্যে শো, সিটের কোনও নম্বর ছিল না। চারিদিক থেকে দল বাঁধা

এবং দল ছাড়া সব ছেলেই ছুটল হলের দিকে। সবার আগেই অবিশ্যি আহ্লাদে আটখানা হয়ে খরগোশের মতো লাফিয়ে গেল ছোট্ট ভিতিয়া কাকু। তাই হোঁচট খেয়ে পড়তে তার দেরি হল না। তার পেছু পেছু ছুটছিল ছোট্ট বাবা। ধাক্কা খেয়ে বাবা পড়ল কাকুর উপর। আর গোটা ক্লাস দল বেঁধে ছুটল দুই ভাইয়ের পেছু পেছু এবং দল বেঁধেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। অতগুলোর ভার তো সহজ নয়। বিশেষ করে যারা চাপা পড়েছে তলের দিকে। খরগোশের মতো লাফিয়ে এসেছিল ভিতিয়া কাকু, এবার কুকুরের কবলে পড়া খরগোশের মতোই কান্না জুড়ল সে। তা শুনে ছোট বাবাও কাঁদতে শুরু করল। এই সময় ছুটে এলেন দিদিমণি এবং অন্য দুই ইশকুলের আরও দুজন মাস্টার। গোটা ভিড়কে থামালেন তাঁরা। টেনে তোলা হল বাবা আর ভিতিয়া কাকুকে। দুজনেরই গা হাত পা ছড়ে গেছে, কালসিটে পড়েছে। সুতরাং আহত হিসাবে সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি পাঠানো হল তাদের। কালসিটে দেখে পিসি খুশি হয়ে মন্তব্য করল, 'দেখলি তো, আগেই বলেছিলাম!'

এরপর ছোট্ট বাবার সিনেমা যাওয়া অনেক দিন বন্ধ ছিল। তবে কত দিন আর নিষেধ চলে। 'লাল দত্যি' ছবিটা বাবা দেখল একদিন। দেখল আরও অনেক ছবি। আজও পর্যন্ত সিনেমা দেখতে ভারি ভালোবাসে বাবা। ভিতিয়া কাকুও।

জ্বালাতন

বাবা যখন ছোট, ইশকুলে ভর্তি হয়েছে, তখন প্রায়ই এইরকম একটা দৃশ্য দেখা যেত। বিরতি শেষ হল। ঘণ্টি পড়ল। সবাই বারান্দা ছেড়ে নিজের নিজের জায়গায় এসে বসেছে। ছোট্ট বাবা শুধু একলা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, ভ্যান ভ্যান করে কাঁদছে। বাবা কাঁদছে আর হাসছে সারা ক্লাস। দিদিমণি ক্লাসে এসে ব্যাপারটা দেখেই বুঝে নেন কী হয়েছে। হেসে বলেন :

'কী রে, ফের বুঝি মেয়েরা তোকে জ্বালিয়েছে।'

ছোট্ট বাবা কাঁদতে কাঁদতেই মাথা নাড়ে।

ছোট্ট বাবাকে রাগাত কেন মেয়েরা? কী করত? খুবই সহজ ব্যাপার। ঘণ্টা পড়তেই ছেলেরা যখন ছুটে আসে, তখন মেয়েরা এসে বসে পড়ত ছোট্ট বাবার ডেস্ক দখল করে। তিন কি চারটি মেয়ে ডেস্কটি জুড়ে বসে বাবার দিকে চেয়ে হাসত খিলখিলিয়ে। বাবা ওদিকে ভারি শান্ত লাজুক ছেলে। ইশকুলে ভর্তি হওয়ার আগে তার ভাব ছিল শুধু একটি মেয়ের সঙ্গে— মাশা। মোটের ওপর মেয়েদের এড়িয়ে চলাই তার অভ্যেস। মেয়েরা সেটা টের পেয়েছিল। তাই পেছনে লাগত তার। এই হল ব্যাপার।

যদি পাশে শুধু একটি মেয়েই বসত, তা-ও নয় হত। কিন্তু তোমার জায়গাটি জুড়ে যখন বসেছে চার-চারটি মেয়ে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে তোমায় দেখে, তখন সে যে একেবারেই অন্য ব্যাপার। তার ওপর যদি সারা ক্লাস সেইসঙ্গে হো হো করে হাসে তাহলে

আর পারা যায় না। ছোট্ট বাবা ক্লাস থেকে পালিয়ে গিয়ে দরজার কাছে কান্না জুড়ত। ক্লাসের ছেলেদের তো তাতে আরও মজা লাগবেই। কেউ কেউ উপদেশ দিত :

'বোকার মতো দেখছিস কী? ভাগিয়ে দে ওদের। লাগা এক ধাক্কা! এই মেয়েটাকে এই এমনি করে। তখন বুঝবে।'

আর যে মেয়েটি সবচেয়ে চেঁচিয়ে হাসত, সবার চেয়ে বেশি জ্বালাতন করত, তাকে ধাক্কা দিত তারা। মেয়েটি ভারি দুরন্ত, ভারি সুন্দর। নামটা বোধহয় তামারা। নয়ত গালিয়া। মানে, ভেরাও হতে পারে, ল্যুসিয়াও হতে পারে। তবে খুব সম্ভবত ভালিয়া। মেয়েটিও নিশ্চয় ভালোই জানত সে ক্লাসের মধ্যে তাকেই ছোট্ট বাবার ভালো লাগে সবচেয়ে বেশি। মেয়েরা সেটা চট করেই বুঝে নেয়। সেইজন্যেই বোধহয় অমন খিলখিলিয়ে হাসত সে। মেয়েটি হাসত, আর ছোট্ট বাবা ওদিকে কেঁদে আকুল।

শেষ পর্যন্ত দিদিমণির বিরক্তি ধরে গেল। একবার কাঁদুনে বাবাকে নিয়ে ক্লাসে ঢুকে দিদিমণি বললেন :

'ক্লাসে ষোলো জন মেয়ে, আঠারো জন ছেলে। ষোলো জন মেয়েই কেবল একটি ছেলের পেছনে লাগে। বাকি সতেরো জনের পেছনে কেন তারা লাগে না বলো তো? কে বলতে পারে?'

গোটা ক্লাস হেসে উঠল। দিদিমণি তখন ফের বললেন :

'কেবল একটা ছেলের পেছনেই কেন লাগে? মোটেই হাসির কথা নয়। উত্তর দাও।'

সবাই তখন চুপ করে গেল। শুধু মেয়েদের মধ্যে চুপি চুপি খিলখিলানি থামেনি। একটি ছেলে হাত তুলে বলল :

'তার কারণ, ও যে কাঁদতে শুরু করে দেয়।'

'ঠিক কথা!' বললেন দিদিমণি, সবাই আবার হেসে উঠল, 'আমি তো অনেক আগেই বলেছি কাঁদার চেয়ে হেসে দেওয়াই ভালো। মনে আছে তো?' জিগ্যেস করলেন ছোট্ট বাবাকে।

কাঁদতে কাঁদতেই বাবা বলল :

'মনে আছে।'

'দেখিস, ভুলিস না কিন্তু,' বললেন দিদিমণি, 'নয়ত মেয়েগুলো তোকে সারাজীবন জ্বালাবে...'

সেটা বাবার মোটেই পছন্দ ছিল না। তাই পরের বার মেয়েরা যখন তার ডেস্ক জুড়ে বসে হাসতে শুরু করল, বাবা কাঁদল না। সোজা গিয়ে সে বসল ঠিক সেই মেয়েটির জায়গায়, যাকে তার ভালো লাগত। তখন সবাই হাসতে লাগল মেয়েটার দিকেই চেয়ে। মেয়েটি অবশ্যি কাঁদল না, তবে হাসিটা বন্ধ হল। সেই থেকে বাবাকে জ্বালাতন করা ছেড়ে দিল মেয়েরা। সারাজীবন তাকে জ্বালাতন করেছে শুধু ছেলেরা। কিন্তু ছেলেরা তো সবাইকেই জ্বালায়। সেইজন্যেই তো ওরা ছেলে।

বাবার বাঘ শিকার

বাবা যখন ছোট, ইশকুলে ঢুকেছে, তখন একবার বাঘ শিকার করে বাবা। বাঘটাও অবিশ্যি ছোট। আর ইশকুলে না পড়লেও সে বাঘ থাকত ইশকুলেরই ময়দানে। ব্যাপারটা এই।

একবার বসন্তকালে ক্লাসের পড়ার পর ছোট্ট বাবা আর তার বন্ধুরা ইশকুলের ময়দানে বসে বসে রোদ পোয়াচ্ছে। ভারি মিষ্টি রোদ। দুনিয়ার সমস্ত ছেলেদের মতোই এক দমকায় রাজ্যের সমস্ত কথা নিয়েই আলাপ করছে ছেলেরা। আলাপ করছে ফুটবল নিয়ে, আগামী কালকের শ্রুতলিখন নিয়ে, গতকালের মারামারি নিয়ে, 'বাগদাদের চোর' সিনেমা নিয়ে, এবং কে কী ধরনের আইসক্রিম ভালোবাসে, কে পাইওনিয়র শিবিরে যাবে, কে মা-বাপের সঙ্গে গাঁয়ের বাড়িতে একঘেয়ে দিন কাটাবে, সবকিছু নিয়েই। গল্প করছে সবাই, বাবা ওদিকে কী একটা বই পড়ছে। বইটার নাম কী তা আর মনে নেই। হয়তো মেইন রিড কিংবা এমার গুস্তাভ। হয়তো-বা জুল ভার্ন। যাই হোক, সবাই চুপ করতেই ছোট্ট বাবা হঠাৎ বলল :

'ইস, বাঘ শিকার করতে পারলে কী মজাই-না হত।'

শুনে সবাই হেসে উঠল, কিন্তু মিশা গর্বুনভ যাকে সবাই ডাকত গর্বুশ্‌কা বলে, চেঁচিয়ে উঠল :

'চলে আয় আমার সঙ্গে!'

সব ছেলেই তখন চেঁচাতে লাগল :

'চলে আয় আমার সঙ্গে, চলে আয়!'

কে একজন হাঁক দিল :

'চল যাই গোটা ক্লাস!'

সবাই চ্যাঁচাল :

'চল যাই গোটা ক্লাস!'

'কিন্তু শিকার করা যায় কী করে?' জিগ্যেস করল মিশা গর্বুনভ।

'খুব সোজা,' বলল ছোট্ট বাবা, 'হাতির পিঠে চেপে যেতে হবে জঙ্গলে। সে কিন্তু গরম দেশের বন, ভয়ানক ঘিঞ্জি। বাঁদর থাকে সেখানে, কলাগাছ, ঝোলাগাছ...'

'ধুর তোর ঝোলাগাছ, শোল মাছ, সাত পাঁচ...' টিটকারি দিল গর্বুশ্‌কা, 'বাঘের কথা বল।'

'বাঘের কথাই তো বলছি। এই জঙ্গলেই বাঘ ওঁৎ পেতে থাকে। তার পর লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতির উপর। অমনি গুলি করতে হয়। হাতিও অমনি শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারে। থেঁতলে দেয় পায়ের তলে। এই দ্যাখ না, সবই ছবিতে দেওয়া আছে।'

সব ছেলেই ছবিটা দেখল অনেকক্ষণ ধরে। শেষকালে গর্বুশ্‌কা বলল :

'তাহলে ব্যস্! তুই, তুই, তুই, তুই আর তুই হবি হাতি। আমি, ও, ও, ও আর ও হব শিকারি। এই ময়দানটা হল জঙ্গল। বন্দুকের বদলে সব শিকারি নেবে একটা করে লাঠি। নিয়েছ সবাই? এবার হাতির পিঠে চেপে চললাম। চুপ্! ওই দ্যাখ বাঘ। দেখেছিস কেমন ডোরা-কাটা!'

'ওটা তো বেড়াল,' বলল ছোট্ট বাবা।

'চুপ করে থাক! কিছুই তুই বুঝিস না! হুকুম দেব আমি! হাতিরা সব এগোও!'

ছোট বাবা ছিল শিকারি। নিজের হাতির উপর চেপে বাবা দেখল ডোরা-কাটাটা অবাক হয়ে চেয়ে আছে হাতি আর শিকারিদের দিকে, এতই হতভম্বের ব্যাপার যে ছুটেও পালাল না। এই সময় হুকুম দিল গর্বুশ্‌কা :

'লাগাও গুলি!'

লাঠি ও ঢিলের বৃষ্টি ছুটল বেড়ালের দিকে। ছোট্ট বাবাও স্থির থাকতে পারল না, লাঠি ছুড়ল, কিন্তু লাগল না। ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে গেল বেড়ালটা। সেই সময় কার একটা ঢিল লাগল তার মাথায়। মিউমিউ করে পড়ে গেল বেড়ালটা। বার দুই খিঁচুনি খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'মারা পড়েছে বাঘ!' চিৎকার করল গর্বুশকা।

কিন্তু ছেলেদের মধ্যে কে যেন বলে উঠল :

'যাহ্ মরে গেল যে বেড়ালটা...'

সবাই ছুটল বেড়ালটাকে দেখতে।

ছোট্ট শান্ত ডোরা-কাটা বেড়ালটা পড়ে আছে। পড়ে আছে, নড়ছে না। হঠাৎ ছোট্ট বাবার মনে হল, বেড়ালটা ছিল জীবন্ত। কিন্তু এখন সেটা মরা। আর কখনও সে লাফালাফি ছোটাছুটি করবে না, খেলবে না অন্য বেড়ালছানার সঙ্গে। কখনও আর সে বড় হুলো হয়ে উঠবে না। ইঁদুর ধরবে না আর, মিউমিউ করবে না চালের উপর। কিছুই আর করবে না। বাঘ-বাঘ খেলার কোনও ইচ্ছেই হয়তো এ বেড়ালের ছিল না। কেউ তো তার মত নেয়নি। চুপ করে বেড়ালছানার কাছে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেরা। চুপ করে রইল গর্বুশ্‌কাও।

হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল :

'আমার বেড়াল! আমার বেড়াল...' কাঁদল মাথায় মস্ত নীল ফিতে বাঁধা ছোট্ট মেয়েটি।

বেড়ালটিকে কোলে তুলে বাড়ি চলে গেল সে। ছেলেরাও চলে গেল যে-যার দিকে, কেউ কারও দিকে চাইতে পারল না।

সেই থেকে বাবা কখনও বেড়াল, কুকুর কি অন্য কোনও জন্তুর পেছনে লাগেনি। এখনও পর্যন্ত বেড়ালটার জন্যে ভারি কষ্ট হয় তার।

ছবি আঁকা

বাবা যখন ছোট, তখন ভারি ভালোবাসত ছবি আঁকতে। একবার রঙিন পেনসিল উপহার পেল বাবা। তার পর থেকে সারাদিন ধরে কেবল ছবিই আঁকত। আঁকত কেবল বাড়ি, প্রত্যেকটা বাড়ির উপর চিমনি। প্রতিটি চিমনি থেকেই ধোঁয়া বেরুচ্ছে। প্রতিটি বাড়ির কাছেই গাছ আর প্রতিটি গাছেই পাখি। বাড়ির রঙ লাল, চালার রঙ হলদে, চিমনির রঙ কালো আর ধোঁয়ার রঙ নীলে গোলাপিতে মেশা। গাছগুলো হত নীল আর পাখিগুলো সবুজ। বেগুনি রঙের আকাশে জ্বলত সোনা রঙের সূর্য, তার পাশেই ভেসে আছে রুপোলি রঙের চাঁদ, চারিপাশে সোনালি-রুপোলি তারা। ভারি সুন্দর হত ছবিখানা, কিন্তু তা দেখে সবাই কেবল একটা কথাই জিগ্যেস করত :

'এমন নীল গাছ আর সবুজ পাখি তুই দেখলি কোথায়?'

বাবাও একই উত্তর দিত :

'কেন, এই ছবিতেই।'

ইশকুলে ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত বাবার ধারণা ছিল ছবি আঁকার হাত ভালোই। কিন্তু ইশকুলে ড্রয়িং ক্লাসে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করল। আঁকা তার এতই খারাপ হত যে ড্রয়িংমাস্টার তাকে কিছুই বলতেন না। অথচ অন্য ছেলেদের বলতেন 'দিব্যি হয়েছে' নয়ত 'ভালো হয়নি' কিংবা 'এই জায়গাটা ঠিক করে আঁক।'

এমনকি 'ভালো হয়নি' এ কথাটাও কখনও তিনি বাবাকে বলেননি। ছোট্ট বাবার ছবি দেখে ড্রয়িংমাস্টার চুপ করে নিজের মাথা চেপে ধরতেন। মুখের ভাবটা হত এমন যেন মস্ত এক টোকো লেবু খাচ্ছেন বিনা চিনিতে। ছাল-সুদ্ধ অমনি একটা লেবু খেয়ে আয়নায় তাকিয়ে দেখো, ড্রয়িংমাস্টারের মুখের ভাব হত ঠিক অমনি।

মেয়েদের মধ্যে কারও কারও আবার কষ্ট হত বাবার জন্যে। ড্রয়িংমাস্টার অন্যদিকে মুখ ফেরালেই বাবার খাতায় চটপট ড্রয়িং এঁকে দিত তারা। যতটা পারা যায় খারাপ করে আঁকারই চেষ্টা করত মেয়েরা, কিন্তু বাবার মতো খারাপ কারুরই হত না। ড্রয়িংমাস্টারও সঙ্গে সঙ্গেই পরের আঁকা ধরে ফেলতেন। ছোট্ট বাবাকে বলতেন :

'কে এঁকেছে এটা?'

ছোট্ট বাবাও সাধুর মতোই কবুল করত :

'আমি নই...'

'সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি,' বলতেন মাস্টার, 'কিন্তু কে করেছে সেইটে জানতে চাইছি। অমন করলে যে তুই শিখতে পারবি না কখনোই। আঁকতে হয় নিজে নিজেই।'

'এখুনি এঁকে দিচ্ছি নিজেই,' বলত বাবা। এবং এঁকে দেখাত। ড্রয়িংমাস্টারও নিজের মাথাটি চেপে ধরে বলতেন :

'হ্যাঁ, এবার বেশ দেখতে পাচ্ছি তোরই আঁকা।'

মাঝে মাঝে অভিভাবক-সভা বসত। তাতে বক্তৃতা দিতেন ড্রয়িংমাস্টার :

'কমরেড অভিভাবকেরা, আমার ক্লাসে ড্রয়িং-এ চমৎকার এগুচ্ছে পাঁচটি ছেলেমেয়ে।'

তাদের উপাধিগুলো জানাতেন।

'অধিকাংশ ছেলেমেয়েই মোটের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে। অল্প কিছু ছেলেমেয়ে খানিকটা কাঁচা।'

এই বলে আরও তিনজনের নাম করতেন মাস্টার। তার পর বলতেন :

'আরও একটি ছেলে আছে...' এই বলে নিজের মাথা চেপে ধরে মুখ ব্যাজার করে ছোট্ট বাবার নাম করতেন, 'ছেলেটি শুধু কাঁচাই নয়। আমার ধারণা কোনও একটা রোগ আছে তার, ফলে কিছুতেই আঁকতে পারে না।' বলে আবার মাথা চেপে ধরতেন তিনি।

নিজেদের ছেলেটির এমন গুণের কথা শুনে ঠাকুর্দা-ঠাকুমার ভারি খারাপ লেগেছিল বৈকি। কিন্তু কথাটা সত্যিই। ইশকুল শেষ হল বাবার। পরে টেকনিকাল স্কুল। তার পর কলেজ। এই এতদিন ধরে বাবা আঁকতে শিখল কেবল বেড়াল। আর বেড়াল তো

সবাই আঁকতে পারে। এমনকি ইশকুলে ঢোকার বয়স হয়নি যাদের তারাও বেড়াল আঁকতে পারে। আর সে আঁকা দেখে রীতিমতো হিংসেই হত বাবার। কেননা ওদের আঁকা বেড়াল হত বাবার চেয়ে অনেক ভালো। অবিশ্যি একবার এমন একজন শিল্পীকে দেখেছিল বাবা যে ছবি আঁকত তার মতোই খারাপ। কিন্তু বলত, 'এই মুখটা, এই গাছটা, এই ঘোড়াটা... এগুলোকে ঠিক এইভাবেই যে আমি দেখি...'

কী আশ্চর্য, এমন একটা কৈফিয়ত যে আছে সেটা কখনও মনেই হয়নি বাবার। কী আফসোস যে ড্রয়িংমাস্টারকে সে কখনও এমনি একটা কৈফিয়ত দিতে পারেনি। দুই হাতেই তাহলে কীভাবেই-না নিজের মাথাটা চেপে ধরতেন মাস্টারমশাই।

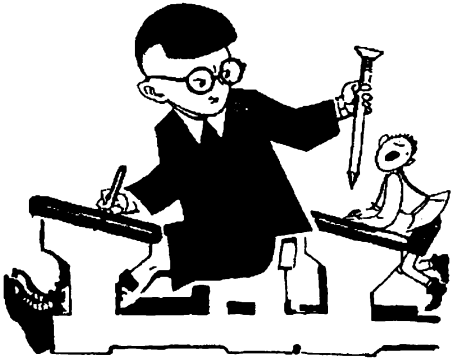

মিথ্যে কথা

বাবা যখন ছোট, ইশকুলে পড়ছে, তখন ক্লাসের দিদিমণিকে ভারি ভালোবাসত বাবা। সব ছেলেমেয়েই ভালোবাসত তাঁকে। মাথায় বেশ লম্বা ছিলেন তিনি, দেখতে তেমন সুন্দর নন, পরতেন সর্বদাই কালচে রঙের পোশাক। দেখতে সুন্দর নন সেটা অবিশ্যি বলত বড়রা। ছোট বাবার কাছে কিন্তু সুন্দরী বলেই মনে হত তাঁকে। সবাই তাঁকে ডাকত আফানাসিয়া নিকিফরভনা। যেমন হাসিখুশি, তেমনি কড়া। তবে সবচেয়ে বড় কথা : ভারি ন্যায়বিচার করতেন। সব ছেলেমেয়েই জানত : আফানাসিয়া নিকিফরভনা যদি কারও ওপর রাগ করেন, তাহলে নিশ্চয় তার কোনও দোষ আছে। ছেলেমেয়েদের ওপর কখনও খামোকা রাগ করেননি তিনি। কোনোরকম একচোখোমিও তাঁর কিছু ছিল না। সব ছাত্রকেই সমান ভালোবাসতেন তিনি। আর দুষ্টুমি করলে কি পড়া না করলে সে যেই হোক রেগে উঠতেন। সব ছেলেমেয়েই জানত যে আফানাসিয়া নিকিফরভনা এ ইশকুলে কাজ করছেন আজ কুড়ি বছর। এ-ও সবাই জানত যে যারা হামবড়াই কি কেপটামি করে, চুপি চুপি অন্যের নামে লাগায় তাদের তিনি পছন্দ করেন না।

পড়াতেন ভারি চমৎকার করে। তাঁর ক্লাসে তাই সবাই শুনত চুপ করে মন দিয়ে। একবার ক্লাসে কে যেন পিন ফুটিয়ে দেয় বাবার পিঠে। বেশ লেগেছিল বৈকি। বাবাও চেঁচিয়ে উঠল :

'উহ্!'

দিদিমণি জিগ্যেস করলেন :

'কী ব্যাপার? পড়ায় ব্যাঘাত করছ যে?'

ছোট্ট বাবা চুপ করে রইল।

দিদিমণি বললেন :

'বেরিয়ে যাও ক্লাস থেকে।'

বাবা উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগুল। এই সময় চেঁচিয়ে উঠল দুটি মেয়ে :

'জাইচিকভ ওর পিঠে পিন ফুটাচ্ছিল!'

আফানাসিয়া নিকিফরভনা তখন বললেন :

'বেশ, যে চিৎকার করেছে, যে পিন ফুটিয়েছে আর যারা পরের নামে নালিশ করতে গেছে, সবাই বেরিয়ে যাক। ঠিক কথা?'

সবাই চ্যাঁচাল :

'ঠিক কথা!'

ছোট্ট বাবা আর জাইচিকভের সঙ্গে মেয়েদুটিও বেরিয়ে গেল ক্লাস থেকে। বাবা যাচ্ছে আর কাঁদছে। ভারি অভিমান হচ্ছিল তার। পিনের খোঁচাটাও সে-ই খেল, আবার ক্লাস থেকেও তাকেই বেরিয়ে যেতে হল। জাইচিকভ কিন্তু যায় আর বাবাকে আর মেয়েদুটিকে নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল মুখে যতই করুক, ফুর্তি ঠিক বেরুচ্ছে না। মেয়েদুটি হাসলও না, কাঁদলও না, তবে তাদেরও অভিমান হচ্ছিল বৈকি!

পরের দিন ছোট্ট বাবা ইশকুলে এল এক মস্ত পেরেক নিয়ে। আফানাসিয়া নিকিফরভনা যখন ছাত্রদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বোর্ডে কী একটা লিখছেন, সেই ফাঁকে ছোট্ট বাবা তার পেরেকটি দিয়ে খোঁচা মারল জাইচিকভের হাতে। জাইচিকভ এমন জোরে কঁকিয়ে উঠল যে আফানাসিয়া নিকিফরভনা ভারি রেগে গেলেন। বললেন :

'জাইচিকভ, আবার তুমি?'

'আ-আ-আমি নই... আ-আ-আমাকেই...' খোঁচার জায়গাটা চেপে ধরে কোঁকালে জাইচিকভ।

'বটে, কাল খোঁচা দিলে, আজ খোঁচা খেলে, তাই না। কে খুঁচিয়েছে ওকে?'

সবাই তাকাল ছোট্ট বাবার দিকে। কিন্তু চুপ করে রইল সবাই। পরের নামে লাগাতে চাইছিল না কেউ। জাইচিকভ পর্যন্ত শুধু ফোঁপাল, কিছু বলল না।

'কে করেছে?' ভয়ানক রাগ করে জিগ্যেস করলেন আফানাসিয়া নিকিফরভনা।

ছোট্ট বাবা এমন ভড়কে গেল যে হঠাৎ বলে বসল :

'আমি ওকে খোঁচাইনি...'

আফানাসিয়া নিকিফরভনা জিগ্যেস করলেন :

'কী দিয়ে খোঁচাওনি?'

জবাব দিলে বাবা :

'এই পেরেকটা দিয়ে।'

সবাই এমন জোরে হেসে উঠল যে পাশের ক্লাসের মাস্টারমশাই পর্যন্ত ছুটে এলেন। বললেন :

'কী ব্যাপার আফানাসিয়া নিকিফরভনা, এত আনন্দ যে?'

আফানাসিয়া নিকিফরভনা বললেন :

'আনন্দের কারণ এই পেরেকটা দিয়ে একটা ছেলে কাউকে খোঁচা দেয়নি, কেউ চ্যাঁচায়নি আর ক্লাসের কেউই কারও নামে লাগায়নি। আর কেউই পুরনো দিদিমণির কাছে কোনও মিছে কথা বলেনি।'

সব ছেলেরই তখন ভারি লজ্জা হল। সবাই রক্তচক্ষুতে চাইল বাবার দিকে। বাবা তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল :

'কাল আমায় খোঁচা দিয়েছিল, আমি চেঁচিয়েছিলাম। আজ আমি ওকে খোঁচা দিই, ও চ্যাঁচায়। মিছে কথা বলেছিলাম আমি।'

এই বলে একটু চুপ করে থেকে বাবা বলল :

'আর করব না আফানাসিয়া নিকিফরভনা।'

'আমিও আর করব না,' বলল জাইচিকভ, কিন্তু সেইসঙ্গে কিল তুলে হুমকি দিল বাবাকে। কেউ অবিশ্যি তার কথা বিশ্বাস করল না।

আফানাসিয়া নিকিফরভনা বললেন :

'মিথ্যে কথা বলার মতো খারাপ আর কিছু হয় না।'

ছোট্ট বাবা তার পর থেকে আর কখনও মিছে কথা বলেনি। মানে, প্রায় কখনও না।

ট্রাম থামানো

বাবা যখন ছোট, ইশকুলে পড়ছে, তখন তার ভাব হয় একটি ছেলের সঙ্গে। নাম তার মিশা গর্বুনভ, কিন্তু ক্লাসে মাস্টাররা ছাড়া কেউ তাকে এ নামে ডাকত না। সবাই বলত গর্বুশ্‌কা।

ভারি দুরন্ত ছিল ছেলেটা। একটা করে ক্লাস শেষ হতেই চারপাশে তার মস্ত ভিড় জমে যেত। বেড়াল ডাকা, কুকুর ডাকা, মৌমাছির বনবন, শুয়োরের ঘোঁৎঘোঁৎ সবই নকল করতে পারত সে। সবচেয়ে তার ভালো উৎরাত মোরগ-ডাক। সে এক পুরো যাত্রা। প্রথমে দেখাত কীভাবে বাচ্চা মোরগ ডাকতে চায় কিন্তু ডাক বেরোয় না। বেরোয় শুধু কোঁ-কোঁ, কিন্তু কোঁকর কোঁ-টা আর হয় না। তার পর বেড়ার উপর উড়ে বসল মোরগটা, জীবনে প্রথম কোঁকর কোঁ ডেকে উঠে ডানা ঝটপট করছে গরব করে। গর্বুশ্‌কা এই সময়টা তার শার্ট তুলে চাপড় মারে ন্যাংটা পেটের উপর। শব্দটা হয় ঠিক ডানা নাড়ার মতোই। তবে টিফিনের ছুটিটা যত বড়ই হোক, গর্বুশ্‌কার সমস্ত প্রতিভা কি আর তাতে কুলায়। তাই ক্লাসের পড়ার সময়েও মাঝে মাঝে মিউমিউ করে ওঠে বেড়াল, ঘোঁৎঘোঁৎ করে ওঠে শুয়োরছানা।

দিদিমণি বলতেন :

'মিশা গর্বুনভ, ঘোঁৎঘোঁৎ মিউমিউ বন্ধ করলি? কোঁকর কোঁ করবি না বলছি! কী, কানে যাচ্ছে না? কুকুর ডাকা থামা! ব্যাঙ ডাকাটা আর কত চলবে? ফের

কিচিরমিচির শুরু করেছিস? সাবধান বলছি, মাছি ডাকতে শুরু করলেই ক্লাস থেকে বার করে দেব।'

তবে ক্লাস থেকে মিশাকে বার করে দেওয়া হত কদাচিৎ। দিদিমণি ভালোবাসতেন গর্বুশ্‌কাকে, প্রায়ই নিজেই হেসে উঠতেন তার এইসব বিদ্যায়। এমনকি হেডমাস্টারও সবার সামনেই না হেসে পারেননি। মিশাকে একবার নিজের দপ্তরে ডেকে পাঠান তিনি, তার দুষ্টুমির জন্যে অনেকক্ষণ ধরে বকাবকি করেন। তার পর বলে দেন :

'যা পালা, আর যেন তোকে এখানে না আসতে হয়!'

মিশাও অমনি মাটিতে হাত দিয়ে 'পি-কক' হয়ে দাঁড়ায় এবং হাতে হেঁটেই বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। এরপরে অবিশ্যি খোদ মিশার অভিভাবকদেরই ডেকে পাঠান হেডমাস্টার, তবে হেডমাস্টার নিজেই যে কী হাসি হেসেছিলেন সেটা সবাই দেখেছে।

একদিন এই মিশাই ক্লাসের পর বলল :

'দেখবি, ট্রামগাড়ি থামিয়ে দেব?'

বলাই বাহুল্য সবাই চেঁচিয়ে উঠল :

'ঠিক আছে, দেখা!'

'চল তাহলে!' বলল গর্বুশ্‌কা।

সবাই তার পেছু পেছু গেল রাস্তায়। ইশকুলের খুব কাছেই ট্রামলাইন।

গর্বুশ্‌কা বলল :

'এখানে দাঁড়া তোরা, এখান থেকে দেখবি।'

দূরে ট্রাম দেখা যেতেই গর্বুশকা লাইনের উপর শুয়ে পড়ে দুই হাতে মাথা ঢাকল। গাড়িটা আসছিল বেশ জোরেই। লাইনের উপর লোক দেখে প্রচণ্ড ঘণ্টি দিতে লাগল ড্রাইভার। গর্বুশ্‌কার কিন্তু নড়ন-চড়ন নেই। প্রচণ্ড শব্দে কাছিয়ে আসছে গাড়ি। ছেলেরা একেবারে আড়ষ্ট। হঠাৎ একেবারে কাছে এসে থেমে গেল ট্রাম। ঘণ্টির শব্দ বন্ধ হতেই গর্বুশ্‌কা লাফিয়ে উঠে ছুটে পালাল গলির মধ্যে। ড্রাইভার শুধু ঘুষি তুলে হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হল। চলে গেল গাড়ি, সব ছেলেও অমনি ছেঁকে ধরল গর্বুশ্‌কাকে।

জিগ্যেস করল :

'কীরকম লাগছিল রে? ভয় করছিল না?'

'ভয়ের কী আছে?' বলল গর্বুশ্‌কা।

'যদি ব্রেক না কষত?'

'তাহলে ড্রাইভারকেই থানায় যেতে হবে।'

'আর যদি তোকে ধরে ফেলত।'

'গাড়ি ফেলে রেখে যাবে কোথায়! আইন নেই।'

বোঝা গেল সবই ভেবেচিন্তে খতিয়ে দেখেছে গর্বুশ্‌কা।

পরের দিন ট্রামগাড়ি থামাল কলিয়া স্তেপানভ। তার পর কস্তিয়া ফেদোতভ। তার পর সিকোর্স্কিরা দুই ভাই। তার পর কে যেন মেয়েদেরও নেমন্তন্ন করল দেখতে। আর সেই হল বাবার কাল। দেখা গেল বাবা ছাড়া সব ছেলেই একবার না-একবার ট্রাম থামিয়েছে। কথাটা মেয়েদেরও জানা, তাই না করা আর চলে না। ইশকুলের সবাই যখন শুনল যে সেদিন ছোট্ট বাবা গিয়ে শুয়েছে লাইনের উপর তখন অন্য ক্লাস থেকেও ছুটে এল মেয়েরা। ছোট্ট বাবা তো ভারি শান্তশিষ্ট ছিল কিনা। কেমন করে সে ট্রাম থামায় সেটা দেখতে লোভ হল সবারই।

এমন ভিড় জমে গেল যে দূর থেকেই ড্রাইভারের চোখে পড়ল সেটা। ছোট্ট বাবা এদিকে চোখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিয়ে শুয়ে আছে লাইনে। ড্রাইভার ওদিকে চুপি চুপি গাড়ি থামিয়ে ছুটল বাবার দিকে।

ছোট্ট বাবার মনে হল যেন ট্রামটা বুঝি না থেমেই এসে পড়েছে তার উপরেই। আসলে এসে পড়েছিল শুধু ড্রাইভার। বাবার কলার চেপে ধরে চিৎকার করল :

'এবার বাছাধনকে ধরেছি!'

ভয়ে ছুটে পালাল সবাই। শুধু মিশা গর্বুনভ গলির মধ্যে থেকে চ্যাঁচাল :

'আইন নেই কিন্তু, আইন নেই!'

কিন্তু কেই-বা তার কথা শোনে।

ছোট্ট বাবাকে নিয়ে যাওয়া হল থানায়। সেখানে তার ঠিকানা টুকে রাখা হল। তার পর ঠাকুর্দা-ঠাকুমা আর ইশকুলের হেডমাস্টারের ডাক পড়ল থানায়। তার পর বাড়িতে শাস্তি পেতে হল ছোট্ট বাবাকে, ইশকুলে লাঞ্ছনা। ইশকুলের দেয়াল পত্রিকায় লেখা বেরুল তার নামে। ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, হেডমাস্টার, সবাই ভেবেছিল একা ছোট্ট বাবাই বুঝি এতদিন ধরে ট্রাম থামিয়েছে। ছোট্ট বাবার ইচ্ছে হচ্ছিল বলে যে গর্বুশ্‌কা, কলিয়া স্তেপানভ, কস্তিয়া ফেদোতভ, সিকোর্স্কি ভাইয়েরা— ট্রাম থামিয়েছে সবাই। ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু বলল না।

এরপর অনেকদিন ধরে এই ঘটনাটা নিয়ে বাবাকে টিটকারি দিত সবাই। সব ছেলে সব মেয়েই হাসাহাসি করত। কেননা ধরা পড়েছিল তো কেবল বাবাই। গর্বুশ্‌কা পর্যন্ত বলল :

'পারিস না যখন, যাস কেন?'

কিন্তু তার পর থেকে আর কেউ কখনও শোয়ার চেষ্টা করেনি লাইনের উপর। ড্রাইভারের হাতে ধরা পড়াটা এখন সৌভাগ্য বলেই বাবা মানে। তার ফলে অন্তত ট্রামগাড়ি চাপা পড়ার বিপদ ঘটেনি কারও। সেটা তো আর কম কথা নয়।

সাপ মারা

বাবা যখন ছোট, ইশকুলে পড়ছে, তখন হঠাৎ একবার সাপ মারে বাবা। ঘটনাটা এই। ক্লাসের পর দিদিমণি একদিন বললেন :

'কাল আমরা সব বেড়াতে যাব বনে। দেখছ তো, কেমন বসন্ত এসে গেছে! বনে বনে বেড়ানো যাবে, কচি ঘাস দেখব, রোদ পোয়াব। কে কে রাজি?'

হাত তুলল সবাই। ছোট্ট বাবাও।

দিদিমণি তখন হেসে বললেন :

'আর কে গররাজি?'

সবাই ফের হাত তুলল। ছোট্ট বাবাও।

'সে আবার কী!' জিগ্যেস করলেন দিদিমণি। ভারি অবাক লেগেছিল তাঁর, 'বনে বেড়াতে চাও, নাকি চাও না?'

'চাই! চাই!' চ্যাঁচাল সবাই।

'তাহলে গররাজির বেলায় হাত তুলে ভোট দিলে যে সবাই?'

সেটা যে কেন সেটা কেউ ঠিক বোঝাতে পারল না। শুধু আস্তে করে একটি মেয়ে বলল :

'ভোট দিতে আমরা ভালোবাসি...'

সবাই হেসে উঠল। দিদিমণিও হাসলেন। বললেন :

'হাঁদারাম সবাই। যাক, সঙ্গে জলখাবার নিতে ভুলো না। বনে তো আর খাবারের দোকান নেই। এবার বাড়ি যাও।'

সবাই তখন উঠে দাঁড়াল।

হঠাৎ ছোট্ট বাবা ফের হাত তুলল।

অবাক হয়ে দিদিমণি বললেন :

'সে কী রে? তুই-ও বুঝি ভোট দিতে ভালোবাসিস?'

হেসে উঠল সবাই। ছোট্ট বাবাও। তার পর বলল :

'কোদাল নিয়ে যাওয়া চলবে?'

আবার হেসে উঠল সবাই। দিদিমণি বললেন :

'তা তোমরা যখন ভোট দিতে ভালোই বাসো, তখন এটার ওপরেও ভোট নেওয়া যাক। কে কে কোদালের পক্ষে?'

সবাই হাত তুলল।

'সর্ববাদীসম্মত!' রায় দিলেন দিদিমণি।

তাই কোদাল নিয়েই বনে গেল বাবা। তখনও তো ভারি ছোট কিনা। আর নিজের কোদালটিকে ভারি ভালোবাসত বাবা। সবাই তার পক্ষে ভোট দিয়েছে বলে বাবার আনন্দের আর সীমা ছিল না।

ভারি ভালো বনটা। শীতের পর গাছে গাছে সবুজ পাতা ফুটেছে। কচি ঘাসগুলো দেখতে এতই সুন্দর যে ভারি অবাক লাগল ছোট্ট বাবার।

দিদিমণি বললেন :

'এই ছেলেরা এই মেয়েরা, দ্যাখো তো গাছটার দিকে। কে বলতে পারে কী গাছ ওটা?'

'ওক গাছ! ওক গাছ!' চ্যাঁচাল সবাই।

আর যে মেয়েটি ভোট দিতে ভালোবাসত (নাম তার ওলিয়া), সে আস্তে করে বলল :

'মহাকায় বুড়ো ওক...'

কেন যে বলল সেটা কেউ বুঝে পেল না। দিদিমণি পর্যন্ত অবাক হয়ে চাইলেন। তার পর ফের জিগ্যেস করলেন :

'আর এটা কী গাছ?'

ফের সবাই চ্যাঁচাল :

'বার্চ গাছ! বার্চ গাছ!'

ছোট্ট বাবার চোখে পড়ল, আবার মুখ খুলছে ওলিয়া। দেখেই আস্তে করে ফোড়ন কাটল বাবা :

'মহাকায় কচি বার্চ!'

তাতে রাগ হয়ে গেল মেয়েটার, জিভ দেখিয়ে ভেঙচি কাটল। বাবা তাতে এবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই বলল :

'মহাকায় কচি জিভ!'

সবাই হেসে উঠল। কিন্তু দিদিমণি বললেন :

'যারা গোলমাল করবে তাদের বন থেকে বার করে দেওয়া হবে।'

এমন কড়া করে বললেন যে ভয়ে সবাই চুপ মেরে গেল। তা দেখে নিজেই হেসে ফেললেন দিদিমণি।

তার পর বলতে লাগলেন কী কী গাছ হয় আমাদের রুশি বনে, কী কী গাছ হয় দক্ষিণ দেশে।

তার পর কে একজন একটা কাচপোকা পেল। সবাই অমনি সুর করে ছড়া কাটল :

কাচপোকা লজ্জাবতী!
যা উড়ে যা ইতি উতি!
নিয়ে আসিস রাঙা মোতি!

কিন্তু লজ্জাবতী কাচপোকার ওড়ার কোনও ইচ্ছে দেখা গেল না। তখন হঠাৎ কার যেন খাবার কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই ভারি খিদে পেয়ে গেল সবার। আর বনের মধ্যে ঘাসের উপর বসে কী ফুর্তি করেই-না সে খাওয়া। মস্ত একটা গাছের গুঁড়ি হল টেবিল। যার যা ছিল সবাই সবার সঙ্গে ভাগাভাগি শুরু করে দিল। তার পর দিদিমণি যখন তাঁর হাতব্যাগ থেকে একবাক্স চকোলেট বার করলেন তখন একেবারে সোনায় সোহাগা। হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল :

'সাপ! সাপ!'

চ্যাঁচাল সেই ওলিয়া মেয়েটি। বসেছিল সে ঘেসো মাঠটার একেবারে ধারে, ছোট্ট বাবার পাশেই। লাফিয়ে উঠেই ক্রমাগত সে চ্যাঁচাতে লাগল :

'সাপ! সাপ!'

লাফিয়ে উঠল ছোট্ট বাবাও। দেখল মেয়েটির কাছেই কিলবিল্ করছে সাপ। জীবনে সেই প্রথম সাপ দেখল বাবা, তাই এমন ভয় পেয়ে গেল যে হাতের কোদালটা দিয়ে প্রাণপণে কোপ বসাল। কোদালটা ছিল বেশ ধারালো, সঙ্গে সঙ্গেই দু আধখান হয়ে গেল সাপটা আর প্রতিটি আধখানাই আলাদাভাবে নড়তে শুরু করল। আঁতকে চ্যাঁচাতে লাগল ওলিয়া। ওলিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবকটি মেয়ে। চ্যাঁচালেন না শুধু দিদিমণি। শুধু চোখ বড় বড় করে তিনি তাকিয়ে রইলেন ছোট্ট বাবার দিকে। বাবা তখন প্রাণপণে কোদাল চালাচ্ছে। দুটো সাপ থেকে হল চারটে সাপ। চারটে সাপ

থেকে আটটা। হয়তো ষোলো কি বত্রিশটা সাপই হয়ে যেত। কিন্তু দিদিমণি ততক্ষণে এসে বাবার হাত ধরে ফেললেন। বললেন :

'হয়েছে! এটা বিষাক্ত নয়, ঘেসো সাপ। লোকের ক্ষতি করে না, বরং উপকারই করে।'

কোপ বসানো থামাল বাবা। চিল্লানি বন্ধ হল মেয়েদের। শুধু ভোট দিতে ভালোবাসত যে মেয়েটি তার চিৎকার তখনও থামেনি :

'ওই মাগো! ঘেসো সাপ!'

শুনে সবকটি ছেলেই টিটকারি দিতে লাগল :

'ওই মাগো! ওই বাবাগো! ঘেসো সাপ গো!'

'চুপ!' বললেন দিদিমণি। সবাই চুপ করলে উনি আস্তে আস্তে বললেন, 'এই ধরনের ঘেসো সাপের বিষ নেই। ওরা বরং উপকারই করে, ওদের মারতে হয় না। কোনগুলো বিষাক্ত কোনগুলোর বিষ নেই সেটা জানা দরকার। আর মনে রেখো, অমন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বোকার মতো চ্যাঁচাবে না কখনও। আর বিষাক্ত সাপ ভেবে কেউ যখন না পালিয়ে বন্ধুকে বাঁচাতে যায়, তখন টিটকারি দিতে হয় না। অবিশ্যি সাপকে কেটে একশো টুকরোই করতে হবে, তারও কোনও প্রয়োজন নেই।'

এবার হেসে উঠল সবাই— সব ছেলে, সবকটি মেয়ে। ছোট্ট বাবা গিয়ে তার কোদালটা ছুড়ে ফেলল ঝোপের মধ্যে। এরপরেও অনেক দিন ছেলেরা তাকে খেপাত, 'ওই মাগো! ঘেসো সাপ! ওই মাগো! ঘেসো সাপ!' বাবার অবিশ্যি ধারণা ছিল খেপাতে হলে খেপানো উচিত ওলিয়াকে। তবে এরপর থেকে সাপ আর কখনও বাবা মারেনি।

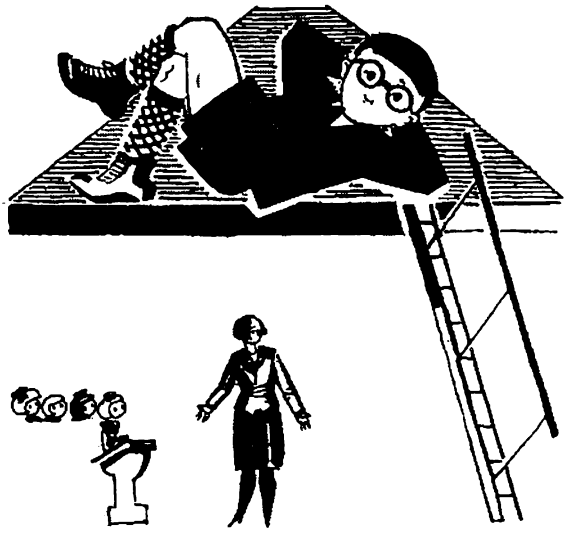

জার্মান ভাষার ওপর প্রতিশোধ

বাবা যখন ছোট, ইশকুলে পড়ছে, তখন নানা বিষয়ে নানারকম নম্বর পেত বাবা। রুশ ভাষায় পেত ভালো নম্বর, পাটিগণিতে চলনসই, হাতের লেখায় খারাপ। ড্রয়িং-এ যাচ্ছেতাই। ড্রয়িংমাস্টার শাসিয়ে রেখেছেন নম্বরটা শিগগিরই শূন্যে গিয়ে থামবে।

একদিন এক নতুন দিদিমণি এলেন ক্লাসে। ভারি সুন্দর দেখতে। হাসিখুশি, অল্প বয়স, পরনে ভারি বাহারে পোশাক। হেসে বললেন :

'আমার নাম ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা। এবার বলো তো তোমাদের কার কী নাম?'

সবাই চ্যাঁচাতে লাগল :

'জেনিয়া!'

'জিনা!'

'লিজা!'

'মিশা!'

'কলিয়া!'

ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা কানে আঙুল দিতে সবাই থামল। উনি বললেন :

'আমি তোমাদের জার্মান ভাষা পড়াব। রাজি আছ তো?'

'রাজি! রাজি!' চ্যাঁচাল গোটা ক্লাস।

এই করেই জার্মান ভাষা শেখা শুরু হল বাবার। জার্মান ভাষায় চেয়ার বলতে হলে যে বলতে হবে ডের স্টুল, টেবিলকে ডের টিশ, বইকে ডাস বুখ, ছেলেকে ডের ক্নাবে, মেয়েকে ডাস মেড্‌হেন— এটায় প্রথম প্রথম বেশ মজা লাগত বাবার।

মনে হত যেন কেমন একটা নতুন খেলা। সে খেলাটা শিখতে সবাই রাজি। কিন্তু যখন সন্ধি বিভক্তি শুরু হল তখন কিছু কিছু ক্নাবে আর মেড্‌হেনের তত ভালো বোধ হল না। বোঝা গেল জার্মান ভাষা শিখতে হবে বেশ মেহনত করে। দেখা গেল খেলাটা পাটিগণিত কি রুশ ভাষার মতোই একটা পাঠ্য বিষয়। জার্মান ভাষায় লেখা, জার্মান ভাষা পড়া এবং জার্মান ভাষায় কথা বলা— তিনটেই একসঙ্গে চালাতে হত। ক্লাসটা যাতে একঘেয়ে না হয় তার জন্যে খুবই চেষ্টা করতেন ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা। মজার মজার গল্পের বই নিয়ে আসতেন ক্লাসে, জার্মান ভাষায় গান গাইতে শেখাতেন, পড়াবার সময় ঠাট্টা-তামাশাও করতেন জার্মান ভাষায়। যারা ঠিকমতো পড়াশুনা করত তাদের কাছে সত্যিই ভালো লাগত ক্লাসটা। কিন্তু যারা তেমন নিয়ম করে পড়াশুনা করত না, তারা বুঝতেও পারত না, তাই ভারি ব্যাজার লাগত তাদের কাছে। ফলে 'ডাস বুখ'-এর পাতা ওলটাত তারা আরও কম, আর দিদিমণি কিছু জিগ্যেস করলে বোবার মতো চুপ করে থাকত। মাঝে মাঝে আবার জার্মান ভাষায় ক্লাস শুরু হয়ে যাবার ঠিক আগেই শুরু হয়ে যেত উদ্দাম চিৎকার, 'ইখ্ হাবে শ্‌পাৎসিরেন!' অনুবাদ করলে মানেটা দাঁড়ায়, 'আমার আছে বেড়ানো!' আর ইশকুল ছাত্রদের কাছে তার অর্থ, 'চল, ক্লাস ফাঁকি দিই।' সে চিৎকার শুনে বহু ছাত্রই ধুয়া ধরত, 'শ্‌পাৎসিরেন! শ্‌পাৎসিরেন!' বেচারি ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা ক্লাসে এসে দেখতেন যে ছেলেরা সবাই গেছে 'শ্‌পাৎসিরেনে,' ডেস্কে বসে আছে কেবল মেয়েরা। বোঝাই যায়, এতে ভারি দুঃখ হত তাঁর। কিন্তু ছোট্ট বাবাও বেশিরভাগ সময়েই 'শ্‌পাৎসিরেন' চালাত।

ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার মনে কষ্ট দেবার কোনও ইচ্ছে ছিল না তার। তবে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ইশকুলের হেডমাস্টার আর মাস্টারদের চোখ এড়িয়ে চিলেকোঠায় লুকিয়ে থাকতে লাগত বেশ ভালো। অন্ততপক্ষে পড়া না করে ক্লাসে বসে থাকা আর ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা যখন প্রশ্ন করতেন, 'হাবেন জি ডের ফেডেরমেসের? (তোমার কাছে পেনসিলকাটা ছুরি আছে কি?') তখন অনেক ভেবেচিন্তে 'ইখ নিখট...' (বা বোকার মতো 'আমি না...') জবাব দেবার চাইতে সেটা অনেক ভালো। ছোট্ট বাবা যখন ওই জবাবটা দেয় তখন সারা ক্লাস হোহো করে হেসে ওঠে। তার পর হাসি শুরু হয় সারা ইশকুলে। আর কেউ বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে সেটা বাবার মোটেই পছন্দ হত না। বরং অন্যকে নিয়ে হাসাটাই বাবার বেশি পছন্দসই। ঘটে বুদ্ধি থাকলে অবশ্য জার্মান ভাষায় মন দিলেই সব চুকে যেত। কেউ আর তখন বাবাকে

নিয়ে হাসত না। কিন্তু তার বদলে ভারি রাগ হয়ে গেল বাবার। রাগ হয়ে গেল দিদিমণির ওপর, জার্মান ভাষার ওপর। জার্মান ভাষার ওপর প্রতিশোধ নিল বাবা। কখনোই ও-ভাষাটায় মন দিত না সে। তার পর অন্য ইশকুলে ফরাসি ভাষা যখন শিখতে হল তখনও উচিতমতো পড়ল না সে ভাষাটা। তার পর কলেজে গিয়ে ইংরেজি ভাষা শেখার পালা, সেটাও পড়ল না। আর এখন প্রায় একটা বিদেশি ভাষাও বাবা জানে না। প্রতিশোধটা তাহলে নেওয়া হল কার ওপর? নিজের ওপরই যে প্রতিশোধ নিয়েছে সেটা এখন টের পেয়েছে বাবা। অনেক ভালো ভালো বই যে ভাষায় লেখা হয়েছিল সেটা সেই ভাষাতেই পড়ার সাধ্যি নেই বাবার। বিদেশে সফর করার ভারি ইচ্ছে হয় তার, কিন্তু একটা ভাষাতেও কথা বলবার শক্তি না থাকায় লজ্জা হয় যেতে। অনেক সময় অন্যান্য দেশের নানা লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় বাবার। রুশ ভাষা তারা ভালো জানে না বটে, কিন্তু শিখছে। সবাই তারা জিগ্যেস করে, 'স্প্রেখেন জি ডইচ?' (জার্মান ভাষা জানেন?), 'পার্লে ভু ফ্রাঁসে?' (ফরাসি ভাষা?), 'ডু ইউ স্পিক ইঙ্গলিশ?' বাবা কেবল হাত উলটিয়ে মাথা নাড়ে। কী আর জবাব দেবে। শুধু 'ইখ নিখ্‌ট...' ভারি এখন লজ্জা হয় বাবার।

দুটি রচনা

বাবা যখন ছোট, ইশকুলে পড়ছে, তখন ভাসিয়া সেরেদিন নামে তার এক বন্ধু ছিল। ভাসিয়ার বাড়িটা ছিল কাছেই। একসঙ্গেই ইশকুলে যেত তারা, একসঙ্গেই বাড়ি ফিরত। ইশকুলেও বসত একই ডেস্কে। অঙ্কের ক্লাসে ভাসিয়া অঙ্ক কষত সবচেয়ে তাড়াতাড়ি। ছোট্ট বাবাকে সে অঙ্ক দেখিয়ে দিত। আর বাবা তাকে সাহায্য করত কবিতা শেখায়, প্রবন্ধ লেখায়। তাই ভারি ভাব ছিল দুজনে। এমনকি মারপিটও তারা করত কেবল নিজেদের মধ্যেই।

একদিন গোটা ক্লাসের জন্যে টাস্ক দিলেন দিদিমণি। 'কী করে গ্রীষ্ম কাটালাম' এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে হবে। ভাসিয়া সেরেদিন বাবাকে বলল :

'কী যে লিখব ছাই মাথায় আসছে না...'

ছোট্ট বাবা জিগ্যেস করল :

'গরমকালে কোথায় ছিলি?'

'গাঁয়ে,' বলল ভাসিয়া।

'গাঁয়ের কথাই লেখ তাহলে।'

'কিন্তু লিখব কী?'

'গ্রীষ্মে কী তুই করেছিলি সেখানে?'

'কিছুই করিনি... নদীতে চান করতাম, দল বেঁধে মাছ ধরতাম, বনে বনে ঘুরতাম...'

'বেশ তো, এইসবই লিখে দে...' বলল ছোট্ট বাবা।

ভাসিয়া সেরেদিন খুবই চটপট তার প্রবন্ধ লিখে বাবাকে দেখাল। তার রচনাটি এই :

কী করে গ্রীষ্মকাল কাটালাম

গ্রীষ্মকালে আমি ছিলাম গাঁয়ে দিদিমার কাছে। চান করতাম, মাছ ধরতাম, ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে ঘুরতাম। গ্রীষ্মকালে গাঁয়ে বেশ লাগে।

ভাসিয়া সেরেদিন

'এ আবার কী রচনা?' বলল ছোট্ট বাবা, 'দিদিমা'র কথা লেখ। কীরকম দেখতে, কী বলতেন, কী করতেন, কী গান গাইতেন...'

'গান গাইত না, গল্প শোনাত,' বলল ভাসিয়া।

'বেশ তো, সেই গল্পের কথাই বল। সঙ্গীসাথিরা কেমন ছিল সেটাও খানিক লেখ। নদীর বর্ণনা দে, বনের বর্ণনা দে।'

'ও আমার ঠিক আসে না,' বলল ভাসিয়া, 'আমি বরং তোকে বলি, তুই লিখে দিস।'

ভাসিয়া তার দিদিমা'র কথা, সঙ্গীসাথিদের কথা, বন-নদীর কথা সব বলল বাবাকে। মস্ত এক রচনা লিখল বাবা। বেশ খেটে লিখেছিল। রচনাটাও দাঁড়াল সুন্দর। ভারি খুশি হল ভাসিয়া। বলল :

'আমি টুকে নিচ্ছি। তুই এবার নিজের রচনাটা লেখ। নয়ত সময় হবে না।'

ভাসিয়া চলে গেল, নিজের রচনা লিখতে বসল ছোট্ট বাবা, কিন্তু তেমন সুবিধা হল না। একই রচনা দু বার লেখা তো আর সহজ নয়। ছোট্ট বাবাও গরমে গিয়েছিল গাঁয়ে, বনে-নদীতে সে-ও ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু সে সবই তো সে লিখে দিয়েছে ভাসিয়ার হয়ে। এখন শুধু তার একটি ভাবনা : এমন রচনা লিখতে হবে যা ভাসিয়ার মতো না হয়, কিন্তু কী করে? নয়ত দিদিমণি চট করেই ধরে ফেলবেন যে রচনাদুটো তারই লেখা। নিজের লেখাটা ভালো হবে কি মন্দ হবে সেদিকে আর নজর দেবার সময় নেই। এবং শেষ পর্যন্ত যে রচনাটি বাবা লিখল সেটি আদৌ ভাসিয়ার মতো হল না। বলতে কি, দিদিমণি বললেন, সেটি একেবারেই বিশ্ববহির্ভূত।

হোমটাস্কের খাতা ফেরত দিয়ে দিদিমণি বললেন :

'এই নাও তোমাদের রচনা। সবচেয়ে ভালো লিখেছে ভাসিয়া সেরেদিন। ওর লেখাটা আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি।'

দিদিমণি বাবার প্রথম রচনাটা পড়ে শোনালেন, যেটি বাবা লিখে দিয়েছিল ভাসিয়ার জন্যে।

দিদিমণি বললেন :

'সাবাস ভাসিয়া! খুব ভালো লিখেছ। বেশ জীবন্ত, ভুল-ভ্রান্তি নেই। সুন্দর তোমার দিদিমা! বন্ধুবান্ধবরাও খাসা!'

এই বলে দিদিমণি কেন জানি তাকালেন বাবার দিকে। ভয়ানক লাল হয়ে উঠল ভাসিয়া সেরেদিন। কেউ তাকে খামোকা প্রশংসা করলে তার ভালো লাগত না। দিদিমণি তার পর বললেন :

'এইবার সবচেয়ে খারাপ রচনাটা আমি পড়ে শোনাব।' এই বলে বাবা দ্বিতীয়বার যে রচনাটি লিখেছিল সেটি পড়ে শোনালেন। এবার লাল হয়ে উঠল বাবা। খামোকা কেউ তাকে তিরস্কার করলে ভারি বিচ্ছিরি লাগত বাবার। ভারি লজ্জা লাগল তার।

বাবার রচনা পড়ে শুনিয়ে দিদিমণি বললেন :

'পরের বার যেন আরও ভালো হয় তোমার রচনা, ভাসিয়ার রচনাও যেন খারাপ না হয়, বুঝেছ?'

'বুঝেছি...' আস্তে করে বলল বাবা।

'আর ভাসিয়া?' জিগ্যেস করল দিদিমণি।

ভাসিয়াও আস্তে করে বলল :

'বুঝেছি...'

দুজনেই বসে আছে লাল হয়ে, সারা ক্লাস তাকিয়ে দেখছে তাদের দিকে, কিছুই বুঝতে পারছে না। বাবা আর ভাসিয়া যে তার পর নিজেরা কোনোরকম যুক্তি করেছিল তা নয়। কিন্তু সেই থেকে অঙ্কের ক্লাসে বাবা নিজেই অঙ্ক কষত, আর ভাসিয়া রচনা লিখত বাবার সাহায্য না নিয়েই। প্রথমদিকে অবিশ্যি প্রায়ই ভুল হত বাবার, ভাসিয়ার রচনাও তেমন ভালো দাঁড়াত না। কিন্তু পরেরদিকে মুশকিল কেটে গিয়েছিল। দুজনেই বুঝল, সবকিছুই নিজের হাতে না করলে কিছুই শেখা যায় না। তার পর থেকে একই ডেস্কে আরও অনেকদিন কেটেছে তাদের।

মায়াকোভস্কির সঙ্গে আলাপ

বাবা যখন ছোট, ইশকুলে পড়ছে, তখন একবার কবি মায়াকোভস্কির সঙ্গে বাবা কথা বলে। মানে মায়াকোভস্কিই কথা বলেন বাবার সঙ্গে। ব্যাপারটা এই।

একবার ছোট্ট বাবা একটা কবিতা লিখলে 'খনিমজুর'। লিখে দিদিমণিকে সেটা দেখাল। দিদিমণি কবিতাটা পড়ে বললেন :

'আমাদের ইশকুলে কেউ কবিতা লেখে না। তাই তোর কবিতাটাই দেয়াল পত্রিকায় দেব। কবিতাটা লিখেছিস, বাহবা দিচ্ছি। তবে ভাবিস না তুই পুশকিন। ভুলিস না কিন্তু।'

ছোট্ট বাবাও কথা দিল যে সে কখনও নিজেকে পুশকিন বলে ভাববে না।

কবিতাটা প্রকাশিত হল। দেয়াল পত্রিকাটা পড়ল গোটা ইশকুল। সবাই জানল যে তৃতীয় শ্রেণির একটি ছেলে কবিতা লেখে। ছোট্ট বাবার খুবই তারিফ করল মাস্টাররা। ছেলেরা বাবাকে খেপাত, 'নেই-কাটলেট কবি!' কথাটায় যে তারা কী বোঝাতে চাইত সেটা আজ পর্যন্ত বাবা জানে না। উঁচু ক্লাসের সব মেয়েই বাবাকে বলত তাদের অটোগ্রাফ খাতায় কবিতা লিখতে। আর দেয়াল পত্রিকার সম্পাদক ঘোষণা করল :

'একটা করে কবিতা দিবি প্রত্যেক সংখ্যায়! নইলে— দেখেছিস তো!' বলে ঘুষি দেখাল।

এরকম সম্পাদক পাওয়া যে ভাগ্যের কথা সেটা বাবা বুঝেছে বড় হয়ে। তখন কিন্তু ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছিল বাবা। সম্পাদকটি সপ্তম শ্রেণির এক ছোকরা। ইয়া চেহারা। তার ঘুষিকে ভয় পাবে না এমন কেউ নেই। সুতরাং দেয়াল পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় বেরুতে থাকল বাবার কবিতা। আর সম্পাদকের দুই হাতে যেহেতু দুটি ঘুষি মারা সম্ভব, তাই কোনও কোনও সংখ্যায় দুটি করে কবিতাও স্থান লাভ করত।

দুনিয়ায় যত রাজ্যের বিষয় আছে সব নিয়েই কবিতা লিখত বাবা। শীত গ্রীষ্ম শরৎ বসন্ত সব নিয়েই কবিতা হল। প্যারিস কমিউন নিয়েও কবিতা ছিল। ব্যঙ্গ কবিতা লেখা হল গুণ্ডাছেলেদের নিয়ে, পরীক্ষার খাতায় নকল করা নিয়ে। লেখা হল 'পুগাচভ বিদ্রোহ' নিয়েও এক কবিতা— অর্থাৎ রসায়ন ক্লাস থেকে গোটা ষষ্ঠ শ্রেণি কীভাবে চলে যায়। রসায়ন মাস্টারের উপাধিটা ছিল পুগাচভ। দু বছরের মধ্যেই ছোট্ট বাবা অনেক কবিতা লিখে ফেলল। সেগুলো ভালো কি মন্দ সেটা অবশ্য বাবা জানত না। ইশকুলে সবাই তাকে বাহবা দিত, কিন্তু বাবার ধারণা ছিল সেগুলো ঠিক খাঁটি কবিতা নয়। তাই সত্যিকারের কবিতা বাবা কখনও লিখতে পারবে কিনা সেটা জানার ভারি ইচ্ছে হত তার। কিন্তু সেকথা তাকে বলবে কে? সন্দেহ নেই যে তা বলতে পারে কেবল সত্যিকারেরই কোনও কবি। সবচেয়ে যে ভালো, সবচেয়ে যে নামকরা। অর্থাৎ মায়াকোভস্কি।

ছোট্ট বাবা তার সেরা কবিতাগুলো গুছিয়ে ঠিক করল মায়াকোভস্কিকে দেখাবে। কিন্তু মায়াকোভস্কির কাছে গিয়ে হাজির হওয়া— সেটা ঠিক সাহসে কুলোচ্ছিল না। বাবা তো তখনও ভারি ছোট কিনা। তাই ঠিক করল টেলিফোন করবে। টেলিফোন গাইডে সে বার করল মায়াকোভস্কির নম্বরটা। তার পর পরপর কয়েক সন্ধ্যা সুযোগ বুঝে, বাড়িতে যখন কেউ নেই, ছোট্ট বাবা তার কবিতাগুলো টেবিলে সাজিয়ে সাহসে বুক বেঁধে টেলিফোন রিসিভার তুলে নম্বরটা বলত... এবং আবার রিসিভার রেখে দিত। খোদ মায়াকোভস্কির সঙ্গে কথা বলার সাহস ঠিক হত না। প্রতি সপ্তাহে পর পর কয়েকবার এমনি চলল। ভারি লজ্জা লাগত বাবার।

শেষ পর্যন্ত একদিন রবিবার সন্ধ্যায় ঠাকুর্দা-ঠাকুমা থিয়েটারে গেছেন, বাবাও সেই সুযোগে টেলিফোন করল মায়াকোভস্কিকে এবং রিসিভার নামিয়ে রাখল না। কানে এল গাঢ়, গমগমে একটা গলার স্বর, সারাজীবন সে স্বরের কথা মনে আছে বাবার। পরে কত লেখা কত গল্প শুনেছে মায়াকোভস্কির গলা নিয়ে। সে সন্ধ্যায় কিন্তু সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর ছিল কেমন যেন উগ্র।

'হ্যালো, কে বলছেন?'

ঘাবড়ে গেল বাবা, কেমন যেন খাবি খেয়ে কিছুই বলতে পারল না। কণ্ঠ ওদিকে গর্জন করছে :

'ফাজলামি করা হচ্ছে? আচ্ছা চিজ তো, রোজ সন্ধেয় কেবল টেলিফোন! টেলিফোন করে চুপ মেরে থাকবে, জ্বালাতনের এক শেষ! তা বলো কিছু-একটা! কী গাইবে গেয়ে নাও বাছাধন, লজ্জা কী!'

ছোট্ট বাবা এমনি ঘাবড়ে গেল যে আতঙ্কে রিসিভার নামিয়ে রাখার কথাও মনে রইল না। একটু মাপ চাইবে, নমস্কার জানাবে, কৈফিয়ত দেবে, কিছু একটা বলবে— সে সুযোগ অনেক আগেই কেটে গেছে... এখন শুধু চুপ করে শোনা ছাড়া করবার কিছুই নেই। তাই শুনেই গেল বাবা।

'বিদায় হে চুপচন্দ্র! ফের যদি কখনও টেলিফোন করো তাহলে টের পাইয়ে ছাড়ব!'

রিসিভার ছেড়ে দিলেন মায়াকোভস্কি। এরপর আর কখনও তাঁকে টেলিফোন করতে যায়নি বাবা। মায়াকোভস্কির সঙ্গে এরপর জীবনে তার দেখাও হয়নি কখনও, কথাও বলেনি। এই কেলেঙ্কারি ঘটনাটার কথাটা পর্যন্ত সে কাউকে জানায়নি। বহুদিন পর্যন্ত এই আলাপটার কথা জানত কেবল দুজন লোক : ছোট্ট বাবা নিজে আর মায়াকোভস্কি। তার পর জানত শুধু একা বাবা। কিন্তু মায়াকোভস্কির সঙ্গে আলাপের এ কথাগুলো তার স্পষ্ট মনে আছে। এবার তোমাদেরও সেকথা জানা রইল।

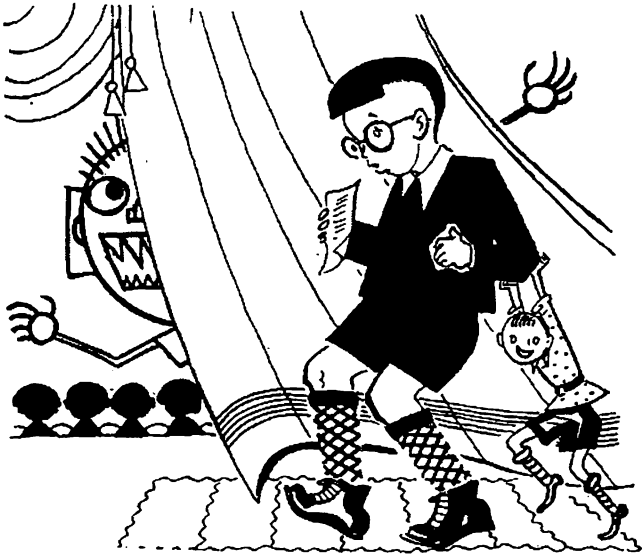

আবৃত্তি

বাবা যখন ছোট, ইশকুলে পড়ছে, তখন একবার অন্য একটা ইশকুল থেকে তাদের নেমন্তন্ন হল সান্ধ্যবাসরে। কিছুদিন আগে সে ইশকুলের ছেলেমেয়েরাও তাদের গুণপনা দেখিয়ে গিয়েছিল বাবাদের ইশকুলের সান্ধ্যবাসরে। গান গায় তারা, নাচে, কবিতা আবৃত্তি করে, শারীরিক কসরত দেখায়। এমনকি পুশকিনের 'বরিস গদুনভ' নাটক থেকে সরাইখানার দৃশ্যটাও অভিনয় করে দেখায়। গ্রিগোরি অত্রেপিয়েভ অবশ্য জানালা দিয়ে লাফাবার সময় পা আটকে গোটা সরাইখানাটাকেই ধূলিসাৎ করে দেয় তা সত্যি। তবে সে তো যে-কোনও লোকের বেলাতেই হতে পারে। কিন্তু অভিনয় করেছিল চমৎকার। এবার ওদের ইশকুলে গিয়ে দেখাতে হবে নিজেদের গুণপনা। সবারই ইচ্ছে হচ্ছিল, অবাক করে দিতে হবে। কিন্তু কী করে? সবাই বলাবলি করল :

'আমরা গান গাইব, ওরাও গান গায়। নাচব, ওরাও নাচে। নাচে বরং আমাদের চেয়ে ভালোই। ব্যায়ামের কসরত আমাদের খারাপ নয়। আমাদের পিরামিড যদি ভেঙে পড়ে, তাতে কী হয়েছে। ওদের সরাইখানাও তো ভেঙে পড়েছিল। আমরা আবৃত্তি করব। ওরাও আবৃত্তি করেছে। এমন কী আছে যেটা ওরা পারে না, আমরা পারি?'

সবাই তখন ভাবতে বসল। ভাবল অনেকক্ষণ ধরে।

'গর্বুশ্‌কা আছে আমাদের,' কে যেন বলল।

সবাই তখন হাসাহাসি চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল :

'কুকুর ডাকতে পারে ও!'

'বেড়াল ডাকতে পারে!'

'মোরগ ডাকতে পারে!'

'পি-কক হয়ে হাঁটতে পারে!'

'দড়ির উপর হাঁটতে পারে!'

'আস্তে!' বললেন দিদিমণি।

সবাই চুপ করতে গর্বুশকা বলল :

'ও আর কী... ও তো সবাই পারে... যদি কবিতা লিখতে পারতাম, তবে না...'

এই বলে সে তাকাল ছোট্ট বাবার দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই মুখ ফেরাল সবাই। দিদিমণি বললেন :

'ঠিক কথা! আমাদের যে কবি আছে।'

'আর ওদের নেই!' চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

বাবা বলল যে স্টেজে দাঁড়িয়ে কিছুই সে কখনও বলেনি, তাতে আবার অন্য ইশকুলে, তাতে আবার নিজের লেখা কবিতা, তাতে আবার...

'তাতে কী হয়েছে! কিচ্ছু ভাবিস না!' চ্যাঁচাল সবাই।

দিদিমণি বললেন :

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে মনে রাখিস, তুই পুশকিন নস।'

কথাটা তিনি বাবাকে প্রায়ই বলতেন, বাবাও কখনও সেটা ভোলেনি।

অবশেষে এল সেই ভয়ঙ্কর দিন। ব্যায়ামবীর, গায়ক আর নর্তকদের সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে ছোট্ট বাবা চলল অন্য ইশকুলে। অচেনা এক মঞ্চে উঠে অচেনা এক হলঘরের দিকে তাকাল। অচেনা ছেলে অচেনা মেয়েয় হলটা ভরা। সামনের সারিতে বসে আছেন অচেনা এক হেডমাস্টার, অচেনা সব মাস্টার। অচেনা সব চোখে তারা তাকিয়ে দেখছে মঞ্চের দিকে, হাসছে অচেনা কোন হাসি। ছোট্ট বাবার বুকের কাঁপুনি বেড়ে উঠতে লাগল কেবলি। তোমরা অবিশ্যি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কী। নেহাত সাধারণ সব ছেলেমেয়ে, সাধারণ সব মাস্টারমশাই দিদিমণিরাই বসেছিল বইকি। তাকিয়ে দেখছিল তারা, হাসছিল, হাততালি দিচ্ছিল— ঠিক বাবাদের ইশকুলে যেমন হয়েছিল তেমনি। পরের ইশকুলে গিয়ে স্টেজে আবৃত্তি করতে বাবার এতই ভয় হচ্ছিল যে মনে হল চারিপাশের সবই যেন কেমন বিদঘুটে।

সদাবিশ্বস্ত গর্বুশ্‌কা বসেছিল পাশেই। খামোকাই সে ফিসফিস করল :

'অন্য ইশকুল! অন্য ইশকুল তো হয়েছে কী। লোক তো সব একইরকম...'

খামোকাই তাকে চকোলেট খাওয়ালে মেয়েরা। খামোকাই দিদিমণি ধমকালেন :

'ছিঃ লজ্জা করে না। কবিতাটা অন্তত মনে আছে তো?'

'মনে আছে...' কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে জবাব দিল বাবা।

শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত এসে গেল। মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হল :

'এবার কবিতা শোনাবে আমাদের ইশকুলের ছাত্রকবি! নিজের লেখা কবিতা।'

হাততালি পড়ে গেল হলঘরে, গর্বুশ্‌কা ঠেলা দিল বাবার পিঠে। আড়ষ্ট পা দু-খানা টেনে কোনোক্রমে মঞ্চে এসে দাঁড়াল বাবা। এমন ভয় সে আর কখনও পায়নি। চোখের সামনে সবকিছু ঘুরছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, আর কানের মধ্যে সমতালে যে আওয়াজটা হচ্ছে সেটা ঠিক সাগরের ঢেউয়ের মতো।

চোখের সামনে কোনও লোক দেখতে পাচ্ছিল না বাবা, কাঁপছে শুধু নানারঙের একটা প্রকাণ্ড পিণ্ড। হাততালি পড়ল। তার পর চুপ হয়ে গেল হলঘর। কবিতা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। ছোট্ট বাবা কিন্তু দাঁড়িয়েই আছে, মুখে রা নেই। গর্বুশ্‌কা পরে বলেছিল যে ছোট্ট বাবা নাকি প্রথমটা একেবারে সাদা মেরে যায়। তার পর নীল হয়ে ওঠে। তার পর সবুজ, আর সারা মুখে ফুটে ওঠে লাল লাল ছোপ।

'একেবারে যেন ঠিক আতসবাজি!' বলেছিল গর্বুশ্‌কা, 'বাজি রেখে বলতে পারি, ওদের ইশকুলে অমন কেরদানি কেউ দেখাতে পারবে না।'

হঠাৎ কে যেন হেসে উঠল হলঘরে। ভাঙা গলায় কবিতা শুরু করল বাবা। নিজেদের ইশকুলের জন্যে একটা স্কুলপ্রশস্তি লিখেছিল বাবা, আবৃত্তি করল সেইটে। প্রথমটা সবাই শুনল মন দিয়েই। কিন্তু ধুয়ার জায়গাটায় গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আসলে ধুয়াটা ছিল এইরকম :

রবিন হুডের সাহস নিয়ে
ঘুরে দ্যাখো বিশ্বময়,
তেইশ নং স্কুলের মতো
পাবে নাকো বিদ্যালয়!

নিজেরাই ভেবে দ্যাখো, এ কবিতা বাবা পড়ছে নয় নম্বর ইশকুলে, সেখানকার ছেলেরা কি কখনও এতে সায় দিতে পারে? নিজেদের ইশকুলকে তো ওরা আর ছোট করতে পারে না, তাই পা ঠুকতে লাগল সবাই, 'হু' দিতে লাগল। আতঙ্কে ছোট্ট বাবা ভেবে পেল না ব্যাপার কী। হাত তুলে সে বলল :

'স্তবকের মাঝখানে বাধা দিও না। স্তবকটা অন্তত শেষ পর্যন্ত পড়তে দাও, তার পর যত খুশি চেঁচিয়ো।'

সঙ্গে সঙ্গেই চুপ হয়ে গেল হলঘর। ছোট্ট বাবা তখনও বোঝেনি যে এরকম অনুরোধ করে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা হল। কেননা নয় নম্বর ইশকুলের

ছাত্ররা ছিল ভারি তুখোড়, বাকি আবৃত্তিটাকে তারা করে তুলল এক মজার খেলা। এক-একটা স্তবক বাবা যতক্ষণ পড়ছিল, ততক্ষণ চুপ করে থাকছিল সবাই। কিন্তু প্রতিটি স্তবক শেষ হতেই যা শুরু হচ্ছিল, সে এক অবর্ণনীয় ব্যাপার। গোটা হলঘর ভরে উঠছিল চিৎকার, বেড়াল ডাক, শিস আর পা ঠোকার শব্দে। তার পর আবার শান্ত হয়ে যাচ্ছিল সবাই। তোতলাতে তোতলাতে পরের স্তবক শোনাল বাবা। অমনি শুরু হয়ে গেল ঠিক আগের মতো কাণ্ড। ওদিকে স্তবকও কম ছিল না কবিতায়। যন্ত্রের মতো জেদ করে শেষ পর্যন্ত আবৃত্তি করে গেল বাবা। যখন শেষ হল, তখন হলঘরে, মঞ্চের পেছনে, নিজেদের লোক, পরের লোক সবাই লুটিয়ে পড়ছে হেসে। গর্বুশ্‌কা তো একেবারে গড়াগড়িই দিতে লাগল মেঝের উপর। এমনকি দিদিমণিও না হেসে পারলেন না। আজও পর্যন্ত বাবা এ লজ্জা ভুলতে পারেনি। অনেক দিন কেটে গেছে। ছোট বাবা বড় হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাঝে মাঝে রাস্তায় হঠাৎ কে এক অচেনা বয়স্ক লোক বাবাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, 'রবিন হুডের সাহস নিয়ে!' তার পর বেড়াল ডেকে উধাও হয়ে যায়। বাবার বুঝতে দেরি হয় না যে বয়স্ক ওই লোকটি যখন ছোট ছিল তখন নিশ্চয় পড়ত নয় নম্বর ইশকুলে। বাবার কবিতার লাইনটা তার মনে থেকে গেছে। তবে বাবাও তো কখনও ভোলেনি যে সে পুশকিন নয়...

পিঙ-পঙ খেলা

বাবা যখন ছোট, ইশকুলে পড়ছে, তখন এক নতুন খেলার চল হল। এখন তাকে বলে টেবিল টেনিস। তখন কিন্তু তার নাম ছিল পিঙ-পঙ। এখনও খেলাটা অনেক ছেলেমেয়েই ভালোবাসে। কিন্তু তখন পিঙ-পঙ খেলা হত প্রতিটি ইশকুলে, প্রতিটি ক্লাসে, প্রতিটি আঙিনায়। খেলা চলত টেবিলের উপর, বেঞ্চির উপর, পিয়ানোর উপর, এমনকি স্রেফ মেঝের উপরেও। আর সে খেলা চলত সকাল থেকে সন্ধে। কেউ কেউ আবার রাতেও ছাড়ত না। অনেকেই দুনিয়ায় পিঙ-পঙ ছাড়া আর সবই ভুলে গেল। ছোট্ট বাবার ইশকুলে চলত রোজই পিঙ-পঙ প্রতিযোগিতা। প্রথমে বাছা হত এক একটা গ্রুপের মধ্যে প্রথম। তার পর প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত ইশকুলের মধ্যে প্রথম স্থান নিয়ে। তার পর ইশকুলের চ্যাম্পিয়নরা খেলত পাড়া চ্যাম্পিয়নশিপের জন্যে। তার পর গোটা শহরের চ্যাম্পিয়নশিপ। তার পর খেলা হত মস্কোর সঙ্গে লেনিনগ্রাদের।

শুনে ভারি আশ্চর্য লাগত বাবার। ছোট্ট সাদা বলটাকে হাতাটা দিয়ে পেটানোয় অত কী মজা থাকতে পারে সেটা বাবা ভেবে পেত না।

'হাতা নয় রে, র‍্যাকেট,' বলত ছেলেরা।

'নয় র‍্যাকেটই হল। কিন্তু তাতে কী?'

'খেলে দ্যাখ।'

'কোনও মজা নেই।'

'মজা লাগবে পরে।'

'কখ্খনো না।'

'খেলেই দ্যাখ না।'

'সাধ নেই।'

তবে কতদিন আর এই ধরনের আলাপ চলতে পারে। তাই, স্বভাবতই, এক শুভদিনে ছোট্ট বাবা পিঙ-পঙ ব্যাট নিয়ে এগুল টেবিলের দিকে। আর সেই হল তার কাল। বললাম বটে শুভদিন। কিন্তু ছোট্ট বাবার বাড়ির লোকদের মতে, অতি অশুভ দিন। আসলে পিঙ-পঙ খেলাটা বাবার ভারি ভালো লেগে যায়। প্রথমটা কিছুই পারছিল না অবিশ্যি। ব্যাট দিয়ে বলটার নাগাল মিলছিল না কিছুতেই। পরে ক্রমশ ব্যাটের আওতায় পাওয়া গেল বলটাকে। কিন্তু কিছুতেই ঠিকমতো টেবিলে ফেরত পাঠানো যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত টেবিলেও বল পৌঁছতে লাগল এবং হঠাৎ ভারি ভালো লেগে গেল খেলাটা। দেখা গেল ট্যাঞ্জেন্ট, স্পিন নানা কায়দার মার আছে। সেসব মারের পর বলটা হঠাৎ কখনও দিক পালটায়, কখনও-বা ভয়ানক আস্তে যায়, কখনও প্রচণ্ড জোরে। ভালো খেলুড়ের লক্ষ্য থাকে এমনভাবে বল দেবে যাতে প্রতিপক্ষ সবচেয়ে অসুবিধার মধ্যে পড়ে। এখনও পর্যন্ত বাবার ধারণা পিঙ-পঙ অতি সুন্দর খেলা। কিন্তু ছেলেবেলায় বাবার কাছে পিঙ-পঙ হয়ে উঠেছিল তার একমাত্র ধ্যান। বই পড়া চুলোয় গেল, ক্লাসের পড়ায় মন নেই। ইশকুলে যে যেত সেটাও লেখা-পড়ার জন্যে নয়, নিজের পেয়ারের খেলাটি খেলতে। খেলা তার ক্রমেই ভালো হতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে খারাপ হতে লাগল পড়াশুনা।

দিদিমণি কয়েকবার বাবাকে এই নিয়ে বলেন। বলতেন, সবেরই একটা মাত্রা আছে। প্রবাদ শোনাতেন : 'বাজে কাজে এক ঘণ্টা, আসল কাজে গোটা মনটা!'

ছোট্ট বাবা কোনও তর্ক করত না। কী দরকার? বাবার কাছে যে পিঙ-পঙটাই কাজের মতো কাজ, বাকি সবই বাজে, সেটা তো আর দিদিমণি বুঝবেন না। পিঙ-পঙ সে খেলত সবচেয়ে বেশিক্ষণ ধরে। অনেককেই হারিয়ে দেয় বাবা। কিন্তু যখন ইশকুলে তিন নম্বর খেলোয়াড়কে সে হারাল, সেদিন দিদিমণি বললেন :

'এভাবে আর চলে না! তোর মা-বাবার সঙ্গে কথা কইতে হবে।'

ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কাছে চিঠি লিখলেন তিনি। সে চিঠি কিন্তু তাঁরা পেলেন না। ছোট্ট বাবা নিজেই সে চিঠিটি লেটার বক্স থেকে বার করে নিজে পড়ে নিজেই ছিঁড়ে ফেলে। ছিঁড়ে একেবারে কুটিকুটি করে— এতই খারাপ লেগেছিল চিঠিটা। দ্বিতীয় চিঠি

পাঠালেন দিদিমণি। সে চিঠিটা বাবার পছন্দ হল আরও কম। তাই আরও কুটি কুটি করে সেটা ছিঁড়া হল।

এ কথা বলতে আমার এখনও লজ্জা হয়। কিন্তু লুকিয়ে তো লাভ নেই।

ঠাকুর্দা-ঠাকুমা আসছেন না দেখে দিদিমণির ভারি অবাক লাগল। কিন্তু তৃতীয় চিঠি তিনি যখন লিখলেন, ততদিনে ইশকুলের চ্যাম্পিয়নকেই হারিয়ে দিয়েছে বাবা। সুতরাং বাবা স্থির করল, এরপর ইশকুলে তার করবার কিছুই নেই। একেবারেই ইশকুলে যাওয়া ছেড়ে দিল সে। সকালে ভান করত যেন পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাগের মধ্যে খাতাও থাকত না, বই-ও থাকত না। থাকত শুধু পিঙ-পঙের দুটি ব্যাট, নেট আর তিনটি বল। আর থাকত কিছু জলখাবার, যেটি বাবা খেত দুপুরের খাওয়ার সময়। তার পর সারা দিন চলত পিঙ-পঙ খেলা। অনেক নতুন নতুন বন্ধু জুটল বাবার, সবাই পিঙ-পঙ ভক্ত। মস্কোর সমস্ত চ্যাম্পিয়নদেরই সে মুখ চিনে ফেলল। বিখ্যাত ফালকেভিচ ভাইয়েরা তাকে দেখলে নমস্কার জানাত। তরুণ টিমে প্রবেশাধিকারও জুটল বাবার এবং প্রতিযোগিতার প্রথম খেলাটাতে হারও হল। অনেক কিছুই হল বাবার... কিন্তু এই সময় চিঠির উত্তর না পেয়ে এবং ইশকুলে বাবাকে না দেখতে পেয়ে দিদিমণি নিজেই এসে হাজির হন বাড়িতে। ছোট্ট বাবা বাড়ি ছিল না, তার বদলে ছিলেন ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা। ছেলে তাঁদের অনেক দিন থেকেই ইশকুলে যাচ্ছে না, সারাদিন কেবল কী এক বল পিটছে, এ খবর শুনে আঁতকে উঠলেন তারা। ভাবলেন নিশ্চয় ছেলের মাথা খারাপ হয়েছে। নিজেরা তো তাঁরা কখনও পিঙ-পঙ খেলেননি। ব্যাট কেড়ে নিয়ে, বল লুকিয়ে রেখে তাঁরা বাবাকে নিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে। সাধারণ ডাক্তার নয়, মস্ত নামকরা এক প্রফেসর। সারাজীবন ধরে এ প্রফেসর পাগলাদের চিকিৎসা করেছেন। কিন্তু ইনিও জীবনে কখনও পিঙ-পঙ খেলেননি। ছোট্ট বাবা পিঙ-পঙের নেশায় পড়াশুনা ছাড়তে পারে এটা তাঁরও বিশ্বাস হচ্ছিল না। আর ছোট্ট বাবাও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না কেন, এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন করা হচ্ছে তাকে। যেমন, প্রফেসর জিগ্যেস করছিলেন :

'ইশকুলে তোকে মারে না তো রে খোকা?'

'রাতে অনিদ্রায় ভুগিস?'

'সকালে মাথা ধরে না?'

'কিংবা সন্ধ্যায়?'

'রাতে দুঃস্বপ্ন দেখিস না তো?'

'মূর্ছা গেছিস কখনও?'

এবং এ সমস্ত প্রশ্নেই বাবা জবাব দিল :

'না।'

তখন প্রফেসর জিগ্যেস করলেন :

'ইশকুলটা তোর পছন্দ হয় তো'?

'ইশকুলের দিদিমণিটা কেমন, ভালো তো?'

'ইশকুলে তোর বন্ধু আছে তো?'

'ছেলে বন্ধু?'

'মেয়ে বন্ধু?'

এবং এইসব প্রশ্নেই ছোট্ট বাবা জবাব দিল :

'হ্যাঁ।'

অবশেষে প্রফেসর বললেন :

'আচ্ছা বল তো, সব মেয়ের চেয়ে কোনও একটা মেয়েকে তোর বেশি ভালো লাগে কিনা?'

বাবা তখন চটে উঠে বলল :

'এ সবে আপনার কী দরকার ডাক্তার? ইশকুলে যাই না পিঙ-পঙ খেলার জন্যে। খামোকা ওসব জিগ্যেস করছেন।'

'তা বেশ,' বললেন প্রফেসর, 'কিন্তু তুই করবি-টা কী?'

'পিঙ-পঙ খেলব,' জবাব দিতে একটুও দেরি হল না বাবার।

'কিন্তু তার পরিণাম কী হতে পারে ভেবে দেখেছিস?'

'ভেবে দেখেছি,' বলল বাবা, 'পরিণামে মস্কো কিশোর গ্রুপের সব্বাইকে হারিয়ে দিতে পারি।'

'ফাজলামি করবি না, বলছি!' চ্যাঁচালেন প্রফেসর।

'সত্যি কথাই বলছি,' বলল বাবা।

তখন প্রফেসর হতাশে হাত নেড়ে ছোট্ট কাচের গ্লাসে খানিকটা ওষুধ ঢাললেন। বললেন :

'খেয়ে নে।'

বাবা বলল :

'বা রে, ওষুধ খাব কেন, আমার তো অসুস্থ বোধ হচ্ছে না।'

'কিন্তু আমার হচ্ছে,' বলে নিজেই ওষুধটা খেয়ে নিলেন প্রফেসর। তার পর শান্ত গলায় বললেন :

'ধর তোর মা-বাপে যদি বলে এখন যত খুশি খেলতে পারিস, কিন্তু শরৎকালে ইশকুলে যেতে হবে, রাজি আছিস?'

'রাজি,' বলল বাবা।

প্রফেসর তখন ঠাকুর্দা-ঠাকুমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন :

'না, ছেলেটির রোগটোগ কিছু নেই। এখন খেলতে চায় খেলুক। এ বছর তো এমনিতেই গেছে।' বলে ফের আরেকটু ওষুধ খেলেন।

ছোট্ট বাবাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হল।

ছোট্ট বাবার টিম কিন্তু প্রথম হতে পারেনি, দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল। কিন্তু বছরটা যে বৃথা গেছে সেকথা বাবা আজও ভাবে না। তবে এটা বাবা ভালোই টের পেয়েছিল যে শুধু পিঙ-পঙ নিয়ে দিন কাটানো যায় না। বলতে কি নিজের ইশকুলের জন্যে মন-কেমনই করত তার। তার পর শরতে ইশকুলের নতুন বছর শুরু হতে আনন্দেই ক্লাসে গেল বাবা। ইশকুল শেষ হল। বহু বছর কেটে গেছে তার পর। আলমারিতে এখনও তার সেই পুরনো পিঙ-পঙ ব্যাটটি আছে। ঠাকুর্দা-ঠাকুমার চোখে সেটা পড়লে তাঁরা এখনও মুখ ব্যাজার করেন। বাবা কিন্তু খুশি হয়েই তাকায় সেটার দিকে। অবিশ্যি পিঙ-পঙের জন্যে ইশকুল ছেড়ে দেওয়াটা খুবই বোকামি হয়েছিল। সে গল্প শুনে আজও পর্যন্ত বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি করে সবাই। বাবার নিজের কাছেও সেটা এখন পাগলামি মনে হয়। তাহলেও পিঙ-পঙ খেলাটা খাসা। তা নিয়ে আলাদা করে পরে কিছু-একটা লিখব। নিশ্চয় লিখব।

তার পর একদিন ছোট্ট বাবার মেয়েটিও যখন পিঙ-পঙ খেলা ধরল, তখন ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছিল বাবা। তবে ভারি খুশি হয়েছিল এই দেখে যে পিঙ-পঙের জন্যে মেয়েটি ইশকুল যাওয়া বন্ধ করছে না। অথচ খারাপ খেলত না মেয়েটি, ইশকুলের চ্যাম্পিয়ন।

তখন ঠাকুর্দা-ঠাকুমার দুশ্চিন্তাটা খানিক আঁচ করতে পারল বাবা। আলমারিতে নিজের পুরনো ব্যাটটি সরিয়ে ফেলল।

তবে এখনও মাঝে মাঝে সেটি বার করে দেখে আর মনে পড়ে যায় পুরনো এই কাহিনীটা।

টুল বানানো

বাবা যখন ছোট, ইশকুলে পড়ছে, তখন নিজেই একবার একটা টুল বানায় বাবা। সারাজীবন সে টুলটার কথা বাবার মনে আছে। আশ্চর্য সে টুল, দুনিয়ায় তেমন আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া ভার। অন্তত তাই ভাবতেন হাতের কাজের মাস্টার জাখার পেত্রভিচ।

বাবাদের ইশকুলে ছিল একটা ছুতোর কারখানা। সেখানে জাখার পেত্রভিচ কাঠের কাজ শেখাতেন ছাত্রদের। কাঠ চেরা, ফোঁড়া, চাঁছা, জোড়া ও ভেঙে ফেলে ফের নতুন করে সব শুরু করতে শেখাতেন তিনি। যতক্ষণ-না জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে। লোকটি বিশেষ লম্বা নন, বুড়ো, চোখে লোহার ফ্রেমের চশমা। প্রায়ই বলতেন, 'কাজ আঁতকায় ওস্তাদকে দেখে,' মাঝে মাঝে যোগ করতেন, 'আর আলসে আঁতকায় কাজ দেখে।'

প্রথম পাঠ তাঁর শুরু হয়েছিল এইভাবে :

'এটা কী জিনিস?'

'হাতুড়ি!' চ্যাঁচাল সবাই।

'ঠিক কথা। আর এটা?'

'পেরেক!'

'ঠিক! আর এটাকে কী বলে?'

'তক্তা!'

'ভালো কথা। এবার এই হাতুড়ি দিয়ে পেরেকটিকে এই তক্তায় এক ঘায়ে বসাতে হবে। পারবে?'

'পারব! পারব!'

অনেকেই এক পায়ে খাড়া। কিন্তু যেসব ছেলেদের গায়ে বেশ জোর আছে তারাও পারল না। জাখার পেত্রভিচ তখন পেরেকটি নিয়ে তক্তার উপর রেখে ঘা মারলেন। খুব একটা জোর বাড়ি নয়। কিন্তু সবাই হাঁ হয়ে গেল : তক্তার মধ্যে একেবারে মাথা পর্যন্ত গেঁথে গেছে পেরেকটা।

'আসল কথা হল চোখের আন্দাজ আর নিখুঁত ঘা,' বললেন জাখার পেত্রভিচ, 'বুঝেছ?'

ছোট্ট বাবা বলল, 'বুঝেছি,' আর হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারল নিজের আঙুলেই।

বেশ লেগেছিল। কিন্তু হেসে উঠল সবাই।

জাখার পেত্রভিচ বললেন :

'হাসির কিছু নেই হে। কী ভেবেছ, বরাবরই কি আর আমি ঠিক পেরেকের মাথাতেই মেরেছি? একেবারে না। হাতুড়ির বাড়ি পড়ত আঙুলে, তার ওপর কর্তার চাঁটি পড়ত মাথায়। বলে, অমন ভুল হয় কেন... এই করেই আমরা শিখেছি।'

ছোটবেলার জাখার পেত্রভিচের জন্যে কষ্ট হচ্ছিল সবারই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উনি হেসে উঠলেন। বললেন :

'ভয় নেই, আমি কাউকে মারব না। এখানে তোমরা নিজেরাই হলে কর্তা। এ সবই তোমাদের। শুরুতে টুল বানানো শেখা যাক।'

টুল! মনে হবে সে তো ভারি সোজা জিনিস। নিজে একবার বানিয়ে দ্যাখো। তা-ও আবার কাঁটায় কাঁটায় মাপমতো! ওহ, কত যে করাত চালাতে, চাঁছতে, জোড়া দিতে, খুলতে এবং ফের গোড়া থেকে সব শুরু করতে হবে তার ইয়ত্তা নেই! তার জন্যে কত-না মেহনত দরকার, কত ঝঞ্ঝাট, কত মাথা-খেলানো আর কতই-না ধৈর্য...

প্রথম টুলটা বানাল মিশা গর্বুনভ।

'বসে দেখুন!' সগর্বে ঘোষণা করল সে।

'তুই নিজেই বস্!' বললেন জাখার পেত্রভিচ।

মিশা গর্বুনভ খুব ভারিক্কি মুখ করে সন্তর্পণে বসতে গেল তার টুলের উপর। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে ভেঙে পড়ল টুলটা। দেখা গেল মেঝের উপর বসে আছে মিশা, সবাই হাসছে।

'তড়িঘড়ি কাজ বটে, সড়গড় নয়!' বললেন জাখার পেত্রভিচ, 'ফের গোড়া থেকে শুরু কর। ছটফট করবি না, নয়ত ফের লোক হাসাবি।'

কেউই একবারেই বানাতে পারল না, সকলকেই কেঁচেগণ্ডূষ করতে হল।

'ভাবনা নেই হে,' সান্ত্বনা দিলেন জাখার পেত্রভিচ, 'একদিনেই তো আর মস্কো গড়ে ওঠেনি। কী ভেবেছিলি তোরা। করাত চালানো, র‍্যাঁদা ঘসা— সেটা সবাই পারে? পারে তা ঠিক। তবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে প্রথমে...'

প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল ছেলেরা। ঠিক ক্লাসের মতোই তো ব্যাপার : যেন কে আগে কষবে অঙ্কটা। মজাও আছে বেশ। অঙ্কের ওপর তো আর কেউ বসে না। কষল, বাস্ ফুরিয়ে গেল। কিন্তু এখানে সবাই নিজের টুলটির উপর বসতেও পারবে। বসার জন্যে নেমন্তন্নও করতে পারবে সবাইকে।

সত্যিকারের টুল প্রথম বানাল ভারিয়া গ্লাজুনভা। মেয়ে! তবে ওর বাবা তো কাঠের কাজের ওস্তাদ। করাত-র‍্যাঁদার শিক্ষা ও বাপের কাছেই পেয়েছে। জাখার পেত্রভিচ খুবই তারিফ করলেন ভারিয়ার।

'পাকা কাজ! ছেলেগুলোর মুখ চুন করে দিলে!'

ছেলেদের অপমান লাগল। ভারিয়াকে খেপাতে শুরু করল তারা। বলল, 'ভারিয়া-মণি ছুতোরানি!'

ভারিয়া কিন্তু চটল না। শুধু জিগ্যেস করল :

'কিন্তু তোদের টুলটি কোথায়, দ্যাখা একবার।'

এর আর কী জবাব দেবে ছেলেরা।

দ্বিতীয় টুলটা কিন্তু করল মিশা গর্বুনভ। ফলে ছেলেরা খানিকটা শান্ত হল। তার পর কেমন যেন হঠাৎ সবাই একসঙ্গে তাদের টুল জমা দিতে লাগল। জাখার পেত্রভিচ বললেন :

'তা ভলোদিয়ার টুলটা খানিকটা টুলের মতো দেখাচ্ছে।'

শেষ পর্যন্ত ছোট্ট বাবাও তার টুল বানাল। ততদিনে হাত-পা তার এখানে কাটা ওখানে ছেঁড়া, নাকে-গালে ছুতোর মিস্ত্রির আটা। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই বাবার। তার জীবনের প্রথম টুলটি যে তৈরি! সে টুলের জন্মদিনে তার যত আনন্দ হয়েছিল সেটা যে তার নিজের জন্মদিনেও হয়নি। নিশ্চয় সেটা ভালোই টের পেয়েছিলেন জাখার পেত্রভিচ।

দৈববাণী দিলেন :

'নে, বস।'

অতি সন্তর্পণে ছোট্ট বাবা বসল তার টুলের উপর। এতটুকু ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ পর্যন্ত হল না। কিন্তু জাখার পেত্রভিচ ভুরু কোঁচকালেন। আস্তে করে বললেন :

'পা গুনে দ্যাখ।'

ছোট্ট বাবার ভারি অবাক লাগল। নিজের পায়ের দিকে তাকাল বাবা। আগের মতোই তো সেই দুটি পা। হঠাৎ যত ছেলেমেয়ে সবাই হাসতে শুরু করে দিল এই সময়। কেউ কেউ আবার হেসে গড়াতে লাগল মেঝের উপর। জাখার পেত্রভিচও হেসে ফেললেন।

আজও পর্যন্ত বাবা ভেবে পায় না পাঁচ-পায়ার টুল বানাবার বুদ্ধি তার কেমন করে খেলেছিল। কিন্তু কোনও ভুল নেই। পাঁচ পায়েই দাঁড়িয়ে আছে টুলটা। আজও পর্যন্ত পাঁচ পায়েই তা বাবার চোখে ভাসে। চার পা নয়, পাঁচ পা! আজও পর্যন্ত জাখার পেত্রভিচের কথাটা কানে বাজে বাবার, 'তিন পেয়েও নয়, পাঁচ পেয়েও নয়! ফের শুরু কর!' যে-কোনও কাজেই একথাটা মনে রাখা দরকার সেটা বাবা এখন বোঝে।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841803968202